৩ এপ্রিল ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

শনিবারের মেলা

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স

শক্ত আহারের

দুটি টিনের সঙ্গে!

নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু
নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্যে উপকারী।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

নির্বাচিত কয়েকটি শহরে, বিশেষ উপহারের টিনের ওপর
স্টক থাকা পর্য্যন্তই এসুযোগ পাওয়া যাবে।

CLARION/B/GX/5/244 BEN

আনন্দমেলা

২০ চৈত্র ১৩৯১ □ ৩ এপ্রিল ১৯৮৫ □ ১০ বর্ষ ২০ সংখ্যা

গল্প

জানকী-মাঈ । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯·
ভোলা । বীরেশ ঘটক ১৬
খেলা । শান্তিকুমার মিত্র ৫১
অদ্ভুত দুই ভূত । কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমার্ধ)

ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত । শৈবাল মিত্র ৩২

কবিতা

টেবোর জঙ্গলে । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৭

বিশেষ রচনা

টোপলজি ও তার বিখ্যাত কয়েকটি সমস্যা । সুজন দাশগুপ্ত ২৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৯

শার্লক হোমসের গল্প

নীলকান্তমণি-রহস্য । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৪৫

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫৫

লেখাপড়া

অর্থ জানো (ব্যপদেশে···পল্লবগ্রাহী) । দেব-সেনাপতি ৫
সহজে ইংরেজি (কেনাকাটার ভিড়ে) । প্রসাদ ৫
আড়িয়াদহ কালাচাঁদ উচ্চ-বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ৫৬

খেলাধুলো

লয়েড গেলেন, ভিভ্ এলেন । রাজা গুপ্ত ৬১
বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতই সেরা । অশোক রায় ৬৩
টেনিসে ভারত ইতালিকে হারাল । সুজয় সোম ৬৫
জিতেও নিরাশ করল রুশিরা । নৃপতি চৌধুরি ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ— অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক । ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

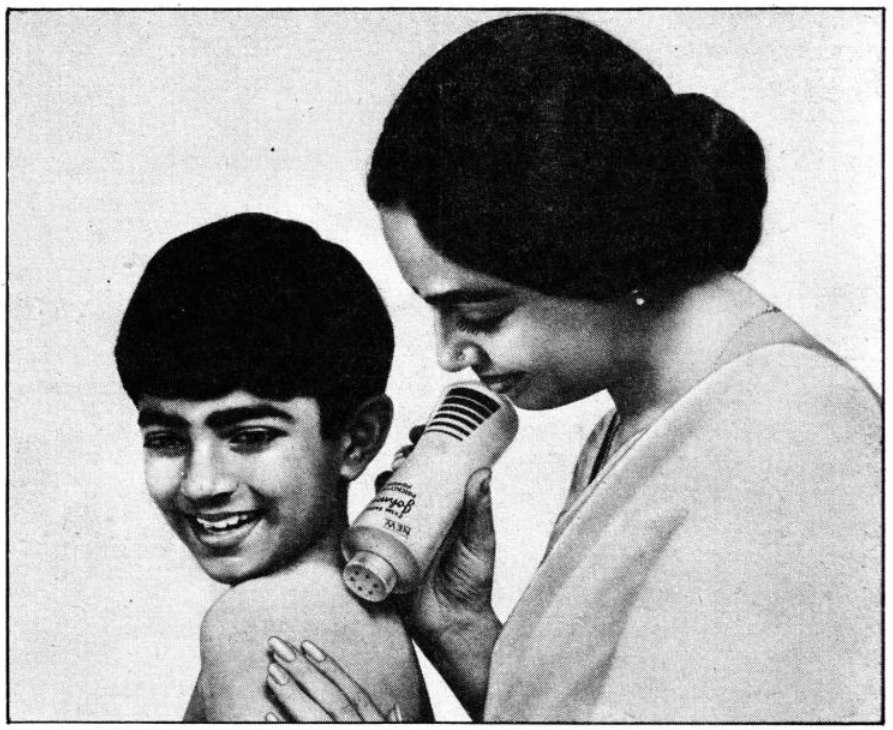

এখন পাবেন!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার

এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে।

ঘামাচিতে আক্রান্ত হবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে সক্ষম?
এখন আরো কার্য্যকরীভাবে আপনি আপনার ঘামাচি সংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার। এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আরো বেশি কার্য্যকরী কেন?
আপনি যখন ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠেন, এবং যখন এই ঘাম আপনার ত্বকে বেশিক্ষণ ধরে থেকে যায়, তখনই আপনি ঘামাচির সম্ভাব্য শিকার হ'তে পারেন। ঠিক এই কারণেই নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এত কার্য্যকরী।

ঘাম ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেবার উপযুক্ত করে বিশেষ ফরমুলাতে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ত্বকের ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ রোধ করে। তাই আর লালচে র‍্যাশ নয়, নয় কোনো জ্বলুনি বা চুলকানি। সত্যি কী দারুণ আরাম! অধিকন্তু, নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এখন একটি মনমাতানো নতুন সুগন্ধে সমৃদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ঘামাচিতে আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন না, তাড়াতাড়ি নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের একটি প্যাক নিন। শুধু শুধু ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে পারেন?

ত ভাবে কাজ করার জন্য
বিশেষ ফরমুলাতে তৈরী:

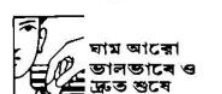

ঘাম আরো ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেয়।

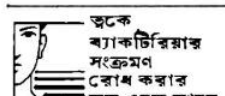

ত্বকে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ রোধ করার জন্য এতে আছে বিশেষ ঔষধি।

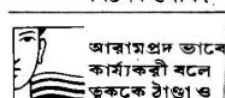

আরামপ্রদ ভাবে কার্য্যকরী বলে ত্বককে ঠাণ্ডা ও তরতাজা রাখে।

Johnson & Johnson

OBM/4181 BEN

অর্থ জানো

ব্যপদেশে…পল্লবগ্রাহী…

তুমি শুনলে, লোকটি কর্ম ব্যপদেশে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। শুনে তুমি কী বুঝলে? শব্দের অর্থ না জানা থাকলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয় আমাদের। নীচের শব্দগুলি আমাদের সুপরিচিত, আর আমরা তা প্রায়ই ব্যবহার করি। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **ব্যপদেশে**—(ক) অন্য দেশ। (খ) উদ্দেশ্য। (গ) দূরদেশ। (ঘ) ছল।

২। **পর্যুষিত অন্ন**—(ক) পান্তাভাত। (খ) পচা ভাত। (গ) বাসী ভাত। (ঘ) অসিদ্ধ ফেনাভাত।

৩। **পাংশু বর্ণ**—(ক) রক্তহীন বর্ণ। (খ) সাদা রঙ। (গ) ভয়ে নীল বর্ণ। (ঘ) ছাই রঙ।

৪। **প্রতুল**—(ক) তুলনার যোগ্য। (খ) অতুলনীয়। (গ) প্রাচুর্য। (ঘ) অভাব।

৫। **পল্লবগ্রাহী**—(ক) যে নানা বিষয়ে অনেক জানে। (খ) পল্লবিত শাখা। (গ) পল্লব-সজ্জিত বৃক্ষ। (ঘ) যার নানা বিষয়ে অল্প জ্ঞান আছে।

উত্তর : ১। ব্যপদেশ—(ঘ) ছল। কর্ম ব্যপদেশে মানে কাজের ছুতো করে। আমরা অনেকেই অর্থ না জেনে উদ্দেশ্য অর্থে ভুল করি।

২। **পর্যুষিত অন্ন**—(গ) বাসী ভাত। যেমন—'তিরস্কার করি অন্ন দিনু পর্যুষিত' (কাশীরাম দাস)।

৩। **পাংশু বর্ণ**—(ঘ) ছাই রঙ অর্থাৎ ফ্যাকাসে। পাংশু শব্দের অর্থ ছাই বা ধুলো।

৪। **প্রতুল**—(গ) প্রাচুর্য। তুল শব্দটির অর্থ **পরিমাণ**। অভাব অর্থে আমরা অপ্রতুল শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করি।

৫। **পল্লবগ্রাহী**—(ঘ) যার নানা বিষয়ে অল্প জ্ঞান আছে। লব শব্দের অর্থ অল্প। পত্রের লব অর্থাৎ অল্প অল্প গজানো পাতা। যেমন—সে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করে, কিন্তু আসলে পল্লবগ্রাহী।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

কেনাকাটার ভিড়ে

সন্ধ্যাবেলা গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছাকাছি ফুটপাথ দিয়ে চলাই কঠিন, এত ভিড়। তবু তারই মধ্যে সওদা চলছে হরেক রকমের। মিলিও বেরিয়েছে মা-বাবার সঙ্গে।

The stalls on the pavement have left a very narrow lane for the use of the pedestrians. And that narrow passage is choked with people.

Struggling to make their way through the milling crowd, Mr. and Mrs. Roy wish they came earlier in the afternoon. The crowd seems to press harder with every passing minute.

But Milly looks quite happy. She doesn't mind crowds. Very glad to have been brought along by Mummy and Daddy, she's enjoying every minute of the shopping expedition.

"Let's go into that shop, Mummy," she cried.

"Which one?" Mrs. Roy asked.

"That one," Milly said, "with the pink silk sari in the show case. So many people are going into it.

Mr. Roy said, "You go in with Mummy. I'll wait here outside."

So, Mrs. Roy went into the shop with Milly and Mr. Roy took his stand on one side of the entrance. To pass the time, he started examining the saris in the show case.

"Which of those saris do I like best? The pink one? I don't think so. A little too vivid for my taste. I'd rather go for the one with the blue border. And what about that yellow sari with blue polka dots? How do I like that one? And the green one with the striking gold border? When Milly grows up, she'll look beautiful in a sari like that. That's the one I'd choose for her on her eighteenth birthday. But that's a long way off yet. How do I know she'd like that sari when she's eighteen? Perhaps she'd insist on buying one of her own choice.

মিলিকে নিয়ে মা বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। দু'জনের হাতে দুটো প্যাকেট।

Mrs. Roy has a large parcel and Milly a smaller one in her hand.

গতবারের মতো এবারেও এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করো :

ONE

এবার কিন্তু দেখাব, শব্দটি লাগানো হচ্ছে অন্য কোনও একটি শব্দের জায়গায়, পুনরুক্তি এড়াবার জন্যে। যেমন ধরো, যদি বলি :

I like this sari better than that sari

তাতে ভুল কিছু হয় না, কিন্তু কানে শুনতে একটু খারাপ লাগে। ভাল শোনায়, যদি বলি :

I like this sari better than that one.

এইবার তোমরা নিজেরাই খুঁজে খুঁজে বের করো আজকের কাহিনীতে কোথায় কোথায় শব্দটি এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসাদ

ডবল P
মানে P
ডবল পাওয়ার

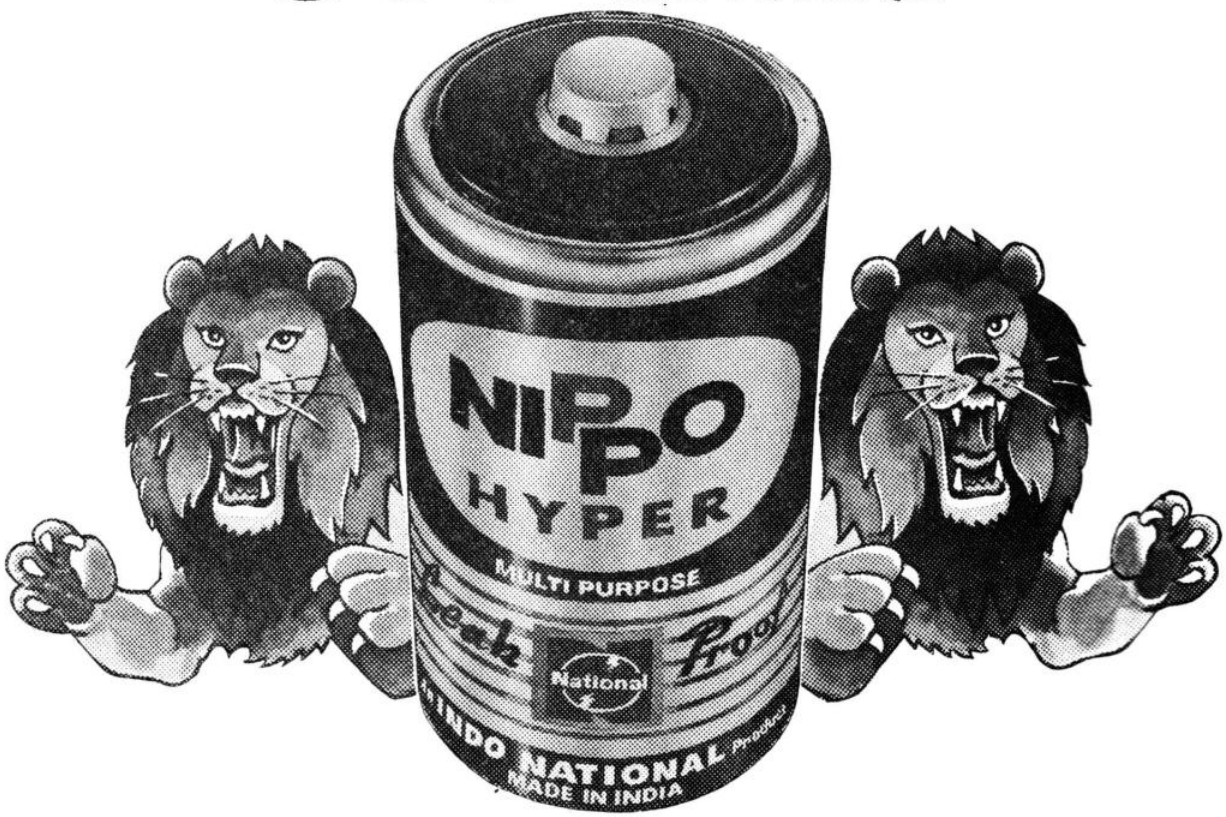

National নিপ্পো

হাইপার ও সুপার

লিক প্রুফ ব্যাটারী

যখন অন্যান্য ব্যাটারী লিক করতে ও শেষ হতে সুরু করে, তখন ধাতব আবরণ যুক্ত নিপ্পো হাইপার ও সুপার বিনা বিরতিতে চালু থাকে। এটা হ'ল ঐ ডবল প্রতিরোধক ব্যবস্থা, যা' এই ব্যাটারীকে দেয় ডবল শক্তি—একটি আঁটসাটো ধাতব জ্যাকেটের ভেতরে একটি মজবুত ভিনাইল টিউব শক্তি প্রবাহকে অবিরাম ও শক্তিশালী করে রাখে।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের তদারকীতে শ্রেষ্ট মানের কাঁচা উপাদানে নিপ্পো প্রস্তুত করা হয়। গত ১১ বছর ধরে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সেরা জিনিসটি এখন তার ১০০ কোটি তম সেল উৎপাদনের উৎসব পালন করছে।

এ ছাড়া রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দী বৈশিষ্টগুলি :

- টপ সীল, কারখানা-তাজা শক্তির গ্যারেন্টি দেয়।
- ISI মার্কা—গুণমান সম্পর্কে আপনার ভরসা।
- জাপানের ন্যাশনাল থেকে বিশ্ব-শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত।
- আপনার কাছে পৌছবার আগে প্রতিটি ব্যাটারী-ইলেকট্রনিক উপায়ে পরীক্ষিত।
- UM-1, UM-2, UM-3—সব ক'টি জনপ্রিয় সাইজে পাওয়া যায়।

everest/d85/INL/60 ben

বদ্‌লে বদ্‌লে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কাল দেখেছিলে একটা কুঁড়ি। আজ সেটা বদলে হয়ে গেছে একটা ফুল। এই বদল এত আস্তে আস্তে ঘটেছে যে, তোমার তা চোখেই পড়েনি। এ যেন পরশুরামের সেই 'হয় হয়, Zানতি পারো না'র ব্যাপার। 'হযবরল'-তে আছে না ? আমি বললাম : কী মুশকিল ! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল। অমনি বেড়ালটা বলে উঠল : মুশকিল আবার কী ? ছিল একটা ডিম। হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

ঠিক কথা। অবশ্য রুমালের বেড়াল হওয়াটা বাদ দিয়ে। ওটা নেহাত একটা কথার কথা।

আচ্ছা, পাখি আর মাছ—এ দুইয়ের মধ্যে কি কোনও মিল খুঁজে পাও ? কিস্যু না। অথচ বিজ্ঞান বলে : ছিল মাছ, হয়ে গেল একটা পাখি। জীবের বংশপঞ্জীতে লতায়-পাতায় এ সম্পর্ক দেখানো আছে।

এখন কথাটা হল : এই বদল যে হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে জানা গেল কেমন করে ?

আমাদের জ্ঞানের বহর কত যে বেড়ে গেছে, চারশো বছর আগের কথা মনে করলেই তা বোঝা যায়।

পৃথিবীর আকার বলতে তখনও লোকের ধারণা কী ছিল ? প্রায় পাঁচশো বছর আগেও লোকে ভাবত, পৃথিবী হল সমতল, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত টানা চলে গেছে। এই ধারণাটা বদলে দিলেন ফার্নান্দো মাগেলান। স্পেনের এক নাবিক। লোকলশকর নিয়ে পৃথিবীর এ-মুড়ো ও-মুড়ো জাহাজে বেড় দিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করলেন যে, ভূমণ্ডল গোলাকার।

তেমনি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই এক সময়ে মনে করত, সৃষ্টির আদিতেও পৃথিবীটা অবিকল এইরকমই ছিল।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে এই ধারণা উল্টে দিলেন এক ইংরেজ। চার্লস ডারউইন। তিনিই প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের লতায়-পাতায় সম্পর্ক আছে। তিনি দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে ক্রমে ক্রমে এক জাত থেকে আরেক জাতের উদ্ভব হল।

(ক্রমশ)

টেবোর জঙ্গলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

টেবোপাহাড় চুড়োর ওপর বনবাংলো থেকে
পাকদণ্ডি পাহাড়ি পথ যাচ্ছে এঁকেবেঁকে।
পাহারাদার আমের বাগান, ভূতলস্পর্শী কুয়ো
শালিখ টিয়া বাবুইপাখির সঙ্গে আচাভুয়ো।

টিলার নীচে ঝর্না ঝোরা তাই সেখানে আসে
বাঘ ভাল্লুক জংলা হরিণ সবাই বারমাসই।
গভীর রাতে হায়না ডাকে আর ডাকে সম্বার,
বাতাস এসে ঝাপটা মারে, ভাঙলে বুঝি দ্বার !

বেশ পুরাতন বাংলোখানির ফায়ারপ্লেসের পাশে
সবাই মিলে জটলা করি শীতকাতুরে মাসে।
উপরে আছে ভিউ-পয়েন্ট, সেখান থেকে আলো
নীচের দিকে ফেললে, বনের সবটা দেখায় ভাল।

কী যেন ওই হঠাৎ সরে, কার যেন চোখ জ্বলে !
স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু টেবোর জঙ্গলে ॥

ছবি : দেবাশিস দেব

এবার দেখুন কেয়ো-কার্পিন চুল!

এ' চুল আপনি খুলেই রাখুন, বিনুনী বাঁধুন, খোঁপাই করুন, বা যা খুশী তাই করুন

এবার আর আধুনিক সাজে সাজতে হলে মাথায় তেল মাখা বন্ধ করতে হবে না।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না এবার আপনি আপনার সুন্দর পরিপাটি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন—বিনুনী বাঁধুন, খোঁপা করুন বা হালফ্যাশন মাফিক চুল খোলাই রাখুন—আপনাকে সমান ভালো দেখাবে আর কেয়ো-কার্পিনের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আপনাকে সারাদিন সতেজ রাখবে

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-1

জানকী-মাঈ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটা দরকারি কাজ নিয়ে পাটনায় এসেছি, কয়েকদিন লাগবে। বারান্দায় টেবিলের সামনে বসে কাজ করছি, তকপিয়ন এসে একটা চিঠি দিল। প্রশ্ন করল, "দেখুন তো, আপনার কি না ?"

ঠিকানার বানানে একটু ভুল আছে বলেই প্রশ্নটা। দেখে নিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আমারই।"

ও চলে গেল।

উলটে দেখি, ছোট-বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরে আমার নাতি শঙ্করের লেখা। বাংলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে সবে উঠেছে। লিখছে—

"মেজোদাদু, আমাদের বাড়িতে জানকী-মাঈ এসেছেন। আর শুধু তিনদিন থাকিবেন। সব কাজ ফেলে যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। পাড়ায় তুলকালাম পড়িয়া গেছে। প্রণাম নেবে সেবক শঙ্কর।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ছেলেমানুষের লেখা, একটা যে কিছু গলদ আছেই, বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মা-জানকী বাড়িতে এসেছেন, তিনদিন মাত্র থাকবেন, পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে—এর মানে কী ? একটু স্থির হয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, 'জানকী' বলে আমাদের কে আছে বাইরে ? না হয় সীতাই, জানকী নামটা বাঙালির ঘরে শুনিনিও···কই, কেউ তো নেই এরকম নামের···

খেয়াল হল এখানে আসা পর্যন্ত বাড়ির কোনও খবর নেওয়া হয়নি। টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে একটা ট্রাঙ্ক কল বুক করে দিলাম। একটু পরে ওদিক থেকে উত্তর এল। শঙ্করের মেজোদিদি শর্মিলা ধরেছে। বললাম,"এক্ষুনি শঙ্করের একটা চিঠি পেলাম, বাড়িতে জানকী-মাঈ এসেছেন। কী ব্যাপার বল্ দিকি ?"

টেলিফোনে প্রথমে একটু হাসি ভেসে এল। তার পরেই, "আমার কাছে আমল না পেয়ে শেষে তোমায় ধরেছে ?···ওসব আর আজকাল কেউ বিশ্বাস করে ? তুমিই বলো মেজোদাদু—কোনওই কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই···"

শর্মিলা কলেজে পড়ে, তায় আবার সাইকোলজি, অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের ছাত্রী। একটা ধমক দিতে হল, "ডেঁপোমি ছেড়ে সাঁটে বল্ কী হয়েছে। তিন মিনিটে পাঁচ টাকা খরচ করাচ্ছিস্, মনে থাকে যেন।"

বলল, "কোথা থেকে একটা হনুমান জুটে মেজদিদির মেয়ে বুবুনের ভক্ত হয়ে উঠেছে, আঁচড়ায় না, কামড়ায় না, তাই থেকে···"

"বুঝেছি। সাবধানে থাকতে বলবি, যতই ভক্ত হোক।" রেখে দিলাম রিসিভারটা।

চিন্তাটা কিন্তু লেগেই রইল। ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। ওদের বাবার অফিসের কাজে ট্যুরে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাড়াতাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস করাও হল না গেছে কি না। বাঁদর, হনুমান, এরা বড়দের কাছেই তাড়া খায়, তাই তাদের

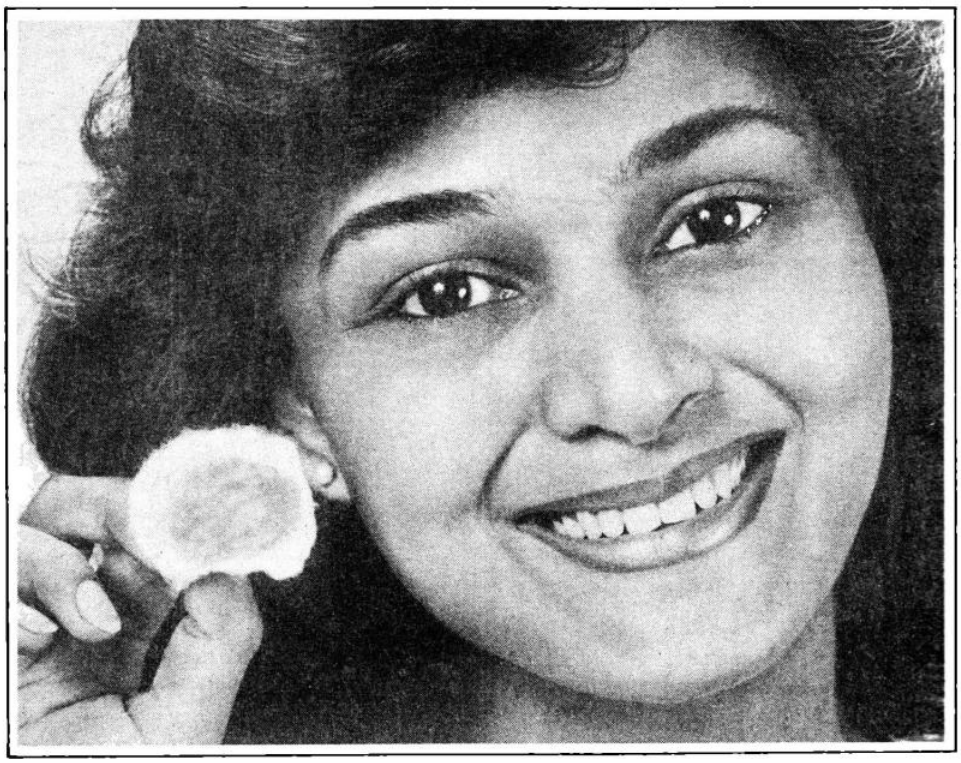

ক্লিয়ারাসিল তুলোর পরীক্ষা করে দেখুন। তেল আর ময়লা দেখছেন তো? এর জন্যই তো ব্রণ হ'তে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার লুকোনো তেলও ময়লা বার করে দিয়ে, মুখমণ্ডলে যে ত্বকের সমস্যার উদ্ভব হয় তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে

তেলতেলে ত্বক ব্রণ হবার মুখ্য কারণ

তেলতেলে ত্বক ধুলোবালি আকর্ষণ করে বলে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্রণ দেখা দেয়। সাধারণ সাবান ও জল শুধু ত্বকের ওপরের ভাগের ময়লাটুকুই পরিষ্কার করতে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার— তেলতেলে ত্বকের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষমতাযুক্ত এবং এতে আছে বিশেষ ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা। এর তেল দ্রবকারী ক্ষমতা এবং পরিষ্কার করার উপাদানগুলি লোমকূপের মুখ খুলে দেয় এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে।

প্রমাণের জন্য, এই তুলোর পরীক্ষাটি করে দেখুন।

প্রথমে আপনার মুখটি যথারীতি ধুয়ে নিন। এবার কিছু তুলো ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এটি দিয়ে মুখ অর্থাৎ, নাক, কপাল, গাল, থুতনীর আসেপাশে মুছে নিন।

ময়লা দেখতে পেলেন তো? এতেই প্রমাণ হয় সাধারণ সাবান ও জল লুকোনো তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে সফল হয় না, কিন্তু ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার কত সহজে তা করেছে।

রক্ষাপ্রদ ঔষধিক্রিয়া ত্বকের সমস্যার সমাধান করেই চলে।

আপনার ব্যবহারের পরেও ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার ত্বককে রক্ষা করে চলে।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে: দিনে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করুন।

ক্লিয়ারাসিল
মেডিকেটেড ক্লেনজার

OBM-3362-BEN

যেমন ভয় করে তেমনি চটাও তাদের ওপর। কচি-কাঁচারা ঘাঁটায় না বলে ওরাও কিছু বলে না, বরং পছন্দই করে, বাধা না পেলে ওদের প্রথায় আদর করতেও দেখা যায়।

বুবুনের বয়স বছর-আড়াই। অত্যন্ত মিশুকে, আদুরে, সবার কোলে-পিঠেই ঘোরে। ব্যাপারটা তা-ই হয়ে থাকবে। আমাদের এটা আবার খাস মিথিলা, মা-জানকীর দেশই···

যতই ভাবি, ভাবনার ফিকরিই বের হয়। এই সেদিন আবার সীতাপঞ্চমী গেল, সীতা-বিবাহের দিন। একটা বিশ্বাস চালু আছে এদেশে, এই সময় সীতা নাকি স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। কারও কারও ওপর 'ভর' হয়। অবশ্য ওসব মেয়েলি কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই বিশ্বাসেই নিশ্চিন্ত হয়ে যদি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে হুজুগের মাথায়।

নিজের মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। শেষে একটা ঠিকও করে ফেললাম। গঙ্গার পুলটা হয়ে পাটনা-দ্বারভাঙ্গা এখন মাত্র তিন ঘন্টার রাস্তা। আজ সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি প্রথম বাসে। স্বচক্ষে দেখেশুনে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে একদিনেই ফিরে আসতে পারব।

শঙ্করের ভাষায় পাড়ায় যে একটা বেশ তুলকালাম পড়ে গেছে, তার নমুনা পাওয়া গেল। আমি পৌঁছলাম বেলা দশটায়। গেট পেরিয়ে রিকশা থেকে নেমে দেখি, বাড়ির দোরগোড়ায় সিঁড়ির ওপর পাঁচ-ছ'জন এদেশী স্ত্রীলোকের জটলা। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে ; হাতে বা কোলের কাছে থালায় কিংবা কুলোয় ফুল, কিছু মিষ্টি—প্যাঁড়া, বাতাসা, লাড্ডু। একটা করে 'বদ্ধি'। অর্থাৎ মাঝে-মাঝে জরি-জড়ানো লাল সুতোর মালা, ধূপকাঠি, পান, সুপুরি। সবার একরকম না হলেও মোটামুটি এই। তবে ফলের মধ্যে শুধু পাকা কলা।

দোর প্রায় বন্ধ করেই রেখেছে। আমি পৌঁছতে জায়গা করে দিতে ভেতরে গিয়ে আর-এক দৃশ্য। উঠোনের মাঝখানে একটা রংচঙে আসন-পাতা জলচৌকির ওপর বুবুন পা ঝুলিয়ে বসে, ফ্রকের ওপর গোটা চার-পাঁচ 'বদ্ধি'র মালা ঝুলছে, ডান হাতে একটা প্যাঁড়া। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পায়ে আলতা পরানোর সঙ্গে গুনগুন করে গান গাইছে, দু'একটা শব্দে মনে হল কবি বিদ্যাপতির লেখা গান। আরও চার-পাঁচজন পূজারিনী অপেক্ষা করছে, দু'একজনের মুখ চেনাও। দেখেশুনে একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়েছি, তবু কিছু একটা বলবার জন্য ওকেই উদ্দেশ করে বললাম, "বাঃ, বুবুন আমাদের যে সত্যিই জানকী-মাঈ হল দেখছি! তা, তোমার রামচন্দ্র কোথায়?"

আড়াইটে বছরও বোধহয় এখনও পুরো হয়নি, মেয়েটা কিন্তু এর মধ্যে কথার ঝুড়ি হয়ে উঠেছে। "নামতন্দোর? নামতন্দোর, বনে গেথে।" উত্তর করল বুবুন। কারও শেখানোই হবে নিশ্চয়, কিন্তু পা দুলিয়ে প্যাঁড়াটায় কামড় দিয়ে বলার ভঙ্গিতে সবাই আধঘোমটার মধ্যে দুলে-দুলে হেসে উঠল। উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললাম, "তা তুই সঙ্গে গেলিনি যে?"

"প্যাঁলা··· মিট্টি।"

সেইজন্যেই যায়নি, ছেলেমানুষ, অত ভেবে বলেনি নিশ্চয়, কিন্তু এবার যা হাসি উঠল, তাতে সমস্ত বাড়িটাই যেন দুলে উঠল। ঘরে ঢুকব, সেখানে আমাদের প্রতিবেশী ঘরের বাঙালি মেয়েদের আর-এক জটলা। চৌকাঠের এদিক থেকেই ফিরে এসেছি, ওপর থেকে শঙ্করের মা কথা মুখে করেই নেমে আসছেন ব্যস্ত হয়ে, "আপনি এসে গেছেন মেজোকাকা? বাঁচলাম। কী আতান্তরে যে পড়ে গেছি! পুজো দেবার ঘটা—কাউকে বারণ করতে পারি না, আর সত্যিই সে কাণ্ড যদি দেখেন! কী যে করে গোদা হনুমানটা এসে···"

বলে ফেলে যেন শুধরে নিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সবাই বলছেন মহাবীরজি নিজেই এসেছেন···" আমায় পেয়ে যেন আরও গুছিয়ে বলতে পারছেন না।

বললাম, "চলো, ওপরেই, এখানে গোলমালে হবে না। অচিন্ত্য ট্যুরে গেছে?"

বললেন, "হয়তো ফিরতে দেরি হবে। আজ জামাইও এসেছেন, তরশু নিয়ে যাওয়ার কথা ওদের। ওঁর বদলিটাও হয়ে গেছে, যা চাইছিলেন। খুব ঘটা করে প্রীতিভোজ দিয়েছিল ফেয়ারওয়েল-পার্টিতে, তার সঙ্গে সিনেমার স্লাইড। উনি এলেই দু'বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘেরেঘুরে বসে, হুল্লোড় পছন্দ করেন তো, তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, কলেজে এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

"মেয়ে দু'জন?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"শ্রাবণী আর শর্মিলা নীচের ঘরেই আছে। আমাদের পাড়ার অনেকে আসছেন তো রোজই, তাঁদের সঙ্গে গল্প করছে।"

"হুঁ, ভেতরের দিকে নিশ্চয়, তাই আমায় দেখতে পায়নি।"

কথা কইতে কইতে ওপরের ঘরে এসে পড়েছি। একটা চেয়ারে বসে বললাম, "এবার বলো তো, ব্যাপারটা কী? বাঙালির মেয়েরাও পুজো দিতে আসেন?"

"আসেন বইকী, যাঁদের মনে একটু শ্রদ্ধাভক্তি আছে। এদেশী মেয়েরা চলে গেলে এঁরা দেবেন। তবে, ওরকম নয়। পাঁচখানা ফ্রক পেয়েছে, কিছু এদিক-ওদিক খেলনাও। আবার নাক সিঁটকোবার লোকও আছে, বিশেষ করে কলেজের কয়েকটা মেয়ে। ওই করতেই আসে তারা। ঘরের মধ্যে এদেরই কণ্ঠ শুনেছেন নিশ্চয়?"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "তাদের মধ্যে তোমার মেজো মেয়ে শর্মিলাও আছে নিশ্চয়? কাল টেলিফোনে···"

"জানি মেজোকাকা, ভাঙে তো মচকায় না," বাধা দিয়ে বললেন বৌমা, "এদিকে আড়াল হয়ে ঠাকুর-দেবতার ছবির সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়েও আছে!"

"পরীক্ষার সময় তো? বেশ, বলো তুমি।"

"কী বলব কাকা, আমার তো ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে।" বলে আর যা-সব বললেন তা মোটামুটি এই :

প্রথমেই লক্ষ করবার জিনিস, ওদের ভাগলপুরে হনুমানের খুব উৎপাত থাকলেও এখানে একেবারে নেই। দৈবাৎ একটা যদি কোথাও ছিটকে এসে পড়ল তো একটু-আধটু তাড়া খেলেই শহর ছেড়ে পালায়। এ-ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। বুবুনকে নিয়ে শ্রাবণী শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার পর হঠাৎ একটা গোদা হনুমান এসে শহরে এমন উৎপাত লাগিয়ে দিল, যেন তিষ্ঠোনো যায় না। কারও অনিষ্ট করা নয় বিশেষ, শুধু এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-ছাত থেকে ও-ছাত, সুবিধে পেল তো কারও ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। ঠিক যেন মনে হয় কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যতই পাচ্ছে না, ততই খেপে উঠছে, তাড়া

খেলে দাঁত খিঁচুনো, তেড়ে আসা—ওই পর্যন্ত। তারপর একদিন এই ব্যাপারটা হল।

এ-জায়গাটা মাঝ-শহরের একটু এদিকে বলে গোদাটা আসে না। একদিন বিকেলে সবাই উঠোনের মাঝখানে বসে গল্প করছেন, ভাগলপুরের হনুমানেরই গল্প, বুবুন ও-বাড়ির তুতুনের সঙ্গে খেলা করছে, বুবুনই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "মহাবিল্‌জি ! মহাবিল্‌জি ! তলা থাবি ?"

সবাই দ্যাখে, ওপরে পুজোর ঘরের ছাতের আল্‌সের ওপর একটি হনুমান কখন এসে বসে আছে। সবাই ভয়ে উঠে পড়ে। উঠে উঠোনের একদিকে জড়ো হয়েছে। ততক্ষণে বুবুন ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে পুরো একছড়া কলা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হনুমানটার সামনে উপস্থিত। একটু হুঁশ ফিরে আসতে সবাই ছুটেছে। শ্রাবণী বলল, "ভয় নেই, আর কিছু করতে হবে না, তামাশাটা দেখে যাও শুধু।"

বুবুন সামনে উবু হয়ে বসে, "তলা থাবি, তলা থাবি" বলে কাঁদি থেকে একটা করে ভেঙে দিচ্ছে, মাঝে-মাঝে মাথায় হাতও বুলিয়ে দিচ্ছে, গোদাটা চুপ করে বসে খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। এদিকে সবাই দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট হয়ে। শেষ হয়ে গেলে বলল, "এবাল দা, আল নেই। আবাল তাল আথবি, তলা দোব।"

যেন বিশেষ কিছু হয়নি, এইভাবে বুবুন লাফাতে লাফাতে ফিরে এল।

গোদাটা যেমন এসেছিল, দু'লাফে ওদিক দিয়ে কোথায় চলে গেল।

ততক্ষণে নীচের সবার পুজো শেষ হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পুজোই। বাঙালি মেয়েদের আরও সংক্ষিপ্তই—একটা কিছু উপহার, প্রণাম, বেশি বয়সের যাঁরা, তাঁদের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

বিবরণটা শেষ করে বউমা বললেন, "এই কাণ্ড মেজোকাকা। আরও আছে, ওঁদের বিদায় করে আসি, নইলে কথা উঠবে যে, বাড়িতে মা-জানকী এসেছেন, গিন্নির তাই মাটিতে পা পড়ে না ! এর মধ্যেই একটু হিংসের ভাব এসে গেছে, চেনেনই তো আমাদের জাতটাকে ! ওই নিন, জামাইও এসে গেছেন। আপনিও তাহলে চলুন। পুজোর ঘরে একটা কাজে এসেছিলাম, ঘরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। এসেই যে ঘরে ঢুকে পড়েনি, আমার বাবার ভাগ্যি !"

নীচে আসতে রঞ্জন প্রশ্ন করল, "আপনি হঠাৎ যে দাদু ?"

নাতি-নাতজামাই দেখলে আমার ঠাট্টার জন্যে মুখ চুলকোয়। বললাম, "আসার সময় কোথা থেকে এক সঙ্গী এনে হাজির করেছ শুনলাম, যুগলরূপ দেখবার জন্যে ছুটে এলাম।"

ও উত্তর দিতে যাচ্ছিল, "তোলা রইল দাদু ! মা রয়েছেন এখন।"

বললাম, "হঠাৎ আসা নয়। তোমাদের দলেরই একজনের হঠাৎ এক চিঠি কাল—'জানকী-মাঈ এসেছেন, মাত্র তিনদিন থাকবেন।' আসতেই হল ছুটে। কী ব্যাপার বলো দিকিন ?"

হাসিঠাট্টার ভাবটা কেটে গিয়ে সবাই গম্ভীর হয়ে পড়েছি। তার মধ্যে রঞ্জন বলল, "একেবারে অতটা নয়, এটা আবার সীতার দেশ বলে বাড়াবাড়ি দেখছি, তবু খানিকটা আশ্চর্যই বইকী। বুবুন তো সেখানেও একজন হিরোইন হয়ে উঠেছে।" তারপর শ্রাবণীর দিকে চেয়ে বলল, "তুমিই বলো না, আমার কিছু বেফাঁস বেরিয়ে গেলে দাদু তো মুখিয়েই আছেন।"

বাইরে কিছু মতামত না দিলেও, একেবারে মা-জানকীর মা হওয়ার জন্যে ভেতরে ভেতরে শ্রাবণীর একটু গুমোর এসে পড়া স্বাভাবিকই। বলল, "বাঁদর-হনুমানেরা ছোটদের কিছু বলে না, এটা জানা কথা, তবু বুবুনের বেলায় একটু বাড়াবাড়িই বইকী। সেখানেও এই রকম একটা হনুমান নিয়েই, মুখ দেখে তো চেনবার জো নেই, তবে পাড়ার অনেকের মতেই খোদ

মহাবীরজিই। ভাগলপুরে তো ওদের উৎপাতের অন্ত নেই, তাই দেখেছেন আমাদের বাড়িটা আগাগোড়া গ্রিল দিয়ে মোড়া। বাবা আর তাঁর ছেলের (রঞ্জনের দিকে চেয়ে নিয়ে) সামনে পড়লে তাড়াই খায়, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়ও দেখায়, কিন্তু বুবুন যদি এল তো একেবারে অন্য চেহারা। এঁরা তাড়ালেও যাবে না, মুখ খিঁচিয়ে ভয়ও দেখাবে না, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে—কত যেন কাকুতিমিনতি—কলা দু'চারটে থাকেই ঘরে—এরকম তো হচ্ছেই রোজ দু'তিনবার করে। বুবুন 'মহাবিল, তলা থাবি, তলা থাবি' বলে গ্রিলের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলা দেবে, ও খেতে খেতে মুখ তুলে দাঁত খিঁচুবে, ওটা তখন ওদের হাসি, চোখের ভঙ্গি করে চাইবে—কথা তো কইতে পারে না, ওই বোধহয় ওদের ভাষা।

"এদিকে বুবুন গায়ে-মাথায় সমানে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, মুখে ওই 'আল খাবি ? আল নেই, দা। আবাল বিতেলে আথবি।'

"ঠিক বিকেল চারটের সময় আবার একবার আসবেই হনুমানটা। তখনও বাবা আর ইনি অফিস থেকে আসেননি তা, থাকলেই একটু আগলে দাঁড়াবেন, ওর সেটুকুও পছন্দ নয় যেন, একেবারে খালি আসর চাই···"

খানিকক্ষণ চলল এই আলোচনা, তারপর খাবার টেবিলে বসেও। ততক্ষণে ভেবেচিন্তে আমিও একটা মতলব ঠিক করে নিয়েছি। বললাম, "এ একটা উটকো, কোথা থেকে এসে-পড়া হনুমান কি স্বয়ং মহাবীর, সেটা জাতভাই বলে রঞ্জনেরই চিনে নেওয়ার কথা। তবু, তোমাদের বিশ্বাস, রামায়ণ থেকে মহাবীরজিই নেমে এসেছেন। এ-কথাটা মেনে নিলেও তোমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তোমাদের দু'জনকেই বলছি। প্রথমত, কলা ছড়াতে ছড়াতে যদি বাড়িটা এই রকম তীর্থস্থান হয়ে পড়ে, পাড়া ছেড়ে সমস্ত শহরের তীর্থ, এইরকম পুজোর ঘটা, তাহলে বাড়ি ছেড়ে তোমাদেরও পালানো ছাড়া উপায় থাকবে না। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, যদি রঞ্জনের আন্দাজই ঠিক হয়, ওদের মেজাজ ও-ই ভাল জানে, তাহলেও তোমাদের সাবধান হতে হবে। বুনো জানোয়ার, কোনও কারণে হঠাৎ খেপে উঠতে কতক্ষণ ? তাই বলি, তোমরা আস্তে-আস্তে এরকম ঢালাও কলার সাপ্লাইটা বন্ধ করো। একটা, দুটো, ব্যস। যদি জানকীভক্ত মহাবীর না হয়ে কদলীভক্ত হনুমান হয় তো আসা ছেড়ে দেবে।"

ওরা তিনদিন পরে চলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার চিকিৎসা চালু রাখবার জন্যে আমিও থেকে গেলাম। বাড়ির পেছনে একটা ছোট বাগান আছে, আমার শখ। গুটিতিনেক কাঁদি কলা পড়েছে, তবে কাঁচা, সেজন্যই হোক, বা মা-জানকীর সম্পত্তি বলেই হোক, সেদিকে নজর দেয়নি।

দুপুরবেলা সবাই ঘুমিয়েছি, হনুমানটা এসেছিল কি না জানি না, তবে বিকেল চারটের পর আমরা চা খাচ্ছি, আবার সকালের সেই ব্যাপার। হনুমানটা লাফ দিয়ে সেই জায়গাটায় এসে বসল। বুবুন কোথায় খেলছিল, "মহাবিল, তলা থাবি ? তলা থাবি ?" বলে ছুটে এসে দেখে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এবার কিন্তু ওই পর্যন্ত। পুজোর কলা যা জমা হয়েছিল, আমার কথামতো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেরিয়ে এসে মুখ চুন করে আমাদের দিকে চেয়ে হাত ঘুরিয়ে বলল, "দা, দা, তলা নেই। মহাবিল কী থাবে ?"

চেহারা দেখলে দুঃখ হয়। শ্রাবণী উঠে পড়ে বলল, "অনেক কলা খেয়ে মহাবীরজির অসুখ করেছে, জাদু। একটা দিচ্ছি, দাও তো। বলো আবার কাল আসতে।"

পাকা মেয়ে। মুখ চুন করে প্রশ্ন করল, "ওছুদ নেই ?"

রঞ্জন বলল, "ওকে ভোলাবে ? এখন হাজির করো ওষুধ।"

শ্রাবণী বলল, "ওষুধ দরকার হবে না। আর কলা না খেলে আপনিই ভাল হয়ে যাবে। যাও, লক্ষ্মীটি।"

আপনার বাচ্চার নরম ত্বকের জন্যে প্রয়োজন,
জনসন্স বেবী পাউডার-এর মমতাভরা পরশের। জনসন্স
বেবী পাউডার জ্বালা থামিয়ে আরাম দেয়, আর
ন্যাপকিন থেকে র‍্যাশ হওয়া নিবারণ করে··· আর,
আপনার বাচ্চাকে রাখে স্নিগ্ধ-শীতল ও আরামের মধ্যে।
এর পরশও আপনার স্নেহের পরশের মতই··· কাছে না
থাকলেও বাচ্চা মনে করবে, আপনি কাছেই আছেন!

Johnson's
baby
powder
PUREST PROTECTION
Johnson & Johnson

কোমল...যেন মমতার পরশ: জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J & J 22 2719 BG

নিরাশ হয়ে মন্থর গতিতে উঠে গেল বুবুন। কী হয় দেখবার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম ছাতের দিকে।

তারপর যা হল তা সত্যি দেখবার মতো। বুবুন ওপরে গিয়ে কলাটা দিতে, ছাড়িয়ে খেয়ে নিয়ে কাতর দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাইছে হনুমানটা, মাথা ঘুরিয়ে দেখছে ফ্রকের পকেটে লুকিয়ে রেখেছে কি না, কুন্‌কুন্‌ করে কান্নার মতো একটা টানা আওয়াজ করে যাচ্ছে, বুবুন সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে, "তেঁদো না থোনা, অথুক কলবে, তেতো ওছুদ থেতে হবে···।" গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একবার ওর মাথাটা টেনে নিজের মাথার সঙ্গে চেপে ধরল। ওর মা যেমন করে ওর আবদার ভাঙাবার চেষ্টা করে।

সবাই একেবারে নির্বাক হয়ে গেছি। তখন কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি। হনুমানটা কান্নার মতো সেই শব্দটা করতে করতে মাথাটা নিচু করে বুবুনের পায়ের ওপর ঘষতে লাগল। বুবুনও কীরকম হয়ে গিয়ে ওপর-নীচে বিহ্বলভাবে চাইছে। শ্রাবণী বলল, "আর যেন দেখা যায় না! কী করি বলো দিকিন মেজোদাদু? এততেও যদি মানুষের রামচন্দ্রের সেই মহাবীরজি বলে বিশ্বাস···"

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, "কোনও সার্কাসের শেখানো হনুমানও তো হতে পারে! পালিয়ে···"

"তুমি চুপ করো দৈবজ্ঞিমশাই! নাস্তিক!" চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল শ্রাবণী। বলল, "যা বোঝো না, তাতে ফোড়ন দিতে এসো না। আমি আর-দুটো দিয়ে আসি।"

দুর্বল মন তো, আমিও একটু কীরকম হয়ে গেছি, বললাম, "তা হলে দিবি তো। বেশিই নিয়ে যাস। আস্তে আস্তে সওয়াতে হবে।"

পরদিনও সকালে-বিকেলে এই রকম করা হল। মহাবীরজি জানকী-মায়ের পায়ে মাথা ঘষছে—কথাটা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের ভিড় গেছে বেড়ে, এদেশী, বাঙালি—শর্মিলার সঙ্গে কলেজের মেয়েরাও আর তত 'আধুনিক' নয়! আলোচনার ধারাটাও আসছে বদলে, এমন সময় আর-এক কাণ্ড!

শ্রাবণীরা আজ সন্ধের গাড়িতে ফিরে যাবে। এদিকে আর-এক ব্যাপার হচ্ছে কাল থেকে। হনুমানটা দু'দিন সকালে এসেছে আগের মতো, কিন্তু কাল বিকেলে আসেনি, আজও সাড়ে-পাঁচটা হয়ে গেল, এল না। আমরা চা খেতে খেতে এই আলোচনা করছি, শ্রাবণী ভেতরে গোছগাছ করছে। শর্মিলা বলল, "তা হলে বোধহয় ভাগলপুরে আগেভাগে খবরটা দিতে গেছে।"

বৌমা বললেন, "গেছে নয়, গেছেন বল্‌। দেখছিস ঠাকুর-দেবতারই কাণ্ড!"

শর্মিলা বলল, "তা হলে আমিও বলি, তোমাদের হতচ্ছেদ্দা দেখে অভিমানেই···"

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ শ্রাবণীর গলার আওয়াজ একেবারে সপ্তমে, "কোথায় গেল সে হতভাগা মেয়ে? আস্ত রাখব না তাকে। তার জানকী-মাঈ হওয়া আমি ঘোচাচ্ছি।···বুবুন, কোথায় গেলি?"

হাতে কলার কাঁদির লম্বা ডাঁটাটা, মাত্র দুটো কলা লেগে রয়েছে। তুলে ধরে বলল, "এই দ্যাখো কী করেছে! মেজোদাদুর বাগানের সবচেয়ে সেরা কানাইবাঁশি কলার কাঁদিটা পাকিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাব বলে কোণের ঘরে একেবারে আলমারির পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলাম।···বুবুন, কোথায় গেলি? বেরিয়ে আয় বলছি। ···দু'দিন থেকে দুপুরে ঘুম ভেঙে দেখি পাশে নেই—উঠে-উঠে গোদাটাকে খাইয়েছে। এই খালি ডাঁটা যদি ওর পিঠে না ভাঙি···।" রাগে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে, হাতের ডাঁটাটা কাঁপছে। এত হঠাৎ আর এতই প্রত্যক্ষ যে, সবাই অবাক হয়ে গিয়ে কী যে বলব যেন ভেবে পাচ্ছি না।

আমিই একটু চেষ্টা করলাম মোড়টা ফেরাতে। বললাম, "ও তো দু'দিন থেকে আসছেই না। তা ছাড়া এদিকে অমন করে লুকিয়ে রেখেছিলি বলছিস···ও বেচারি ছেলেমানুষ···"

ঘুরে আমার দিকে চেয়ে ঝেঁঝে উঠল শ্রাবণী, "তোমার আদরের 'মা-মণি'কে চেনো না তুমি যখন মেজোদাদু, তখন তার হয়ে ওকালতি করতে এসো না। সমস্ত বাড়ির অলিগলি ওর নখদর্পণে। আর আমার নিজের একটি একটি করে গোনা তিয়াত্তরটা কলা ওই পেটে সেঁধিয়েছে এই দুটো দিনে। অত বড় কানাইবাঁশি কলা এক-একটা, তার নড়বার ক্ষমতা আছে যে, লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে আসবে?···না, এসব আমায় ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র, আমি কিন্তু ভুলব না।···কোথায় গেলি, বেরিয়ে আয় বলছি বুবুনি।···বেশ, আমিই তবে এই আসছি।"

পা বাড়িয়েছে। "থাম্‌, আমি দেখছি, অত মা-গিরি ফলাতে হবে না," বলে আমিও উঠতে যাব, শঙ্কর পাশেই মুখ চুন করে বসে ছিল, আমার জামায় টান দিল। ঝুঁকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার আবার কী?"

সবাই থমকে গেছে। একবার সবার ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে এনে কানে-কানে যা বলল, তাতে আমার মুখে একটু হাসি আর সবার দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটে উঠল। হাসিটা স্পষ্ট করে নিয়ে রঞ্জনের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললাম, "শঙ্কর বলছে, সেদিন সাহেবগঞ্জে ফেয়ারওয়েল পার্টিতে যেমন ঘটা করে রঞ্জনকে প্রীতিভোজ খাইয়েছে, বুবুন সেই রকম বিদায়ের সময় তার ভক্তকে কলার কাঁদিটা···"

বৌমা মুখ টিপে ঘাড় হেঁট করে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। তারপর সবার মুখেই যে হাসিটা ফুটি-ফুটি করছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়ে সবাই দুলে-দুলে হেসে উঠল। রঞ্জনও বাদ গেল না। শ্রাবণী তার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে হাসি-হাসি মুখটা ঘুরিয়ে চলে গেলে সে-ও শঙ্করকে উদ্দেশ করে, ওদের সম্বন্ধের মধুর সম্ভাষণ উচ্চারণ করে হাসতে হাসতেই চলে গেল।

শঙ্কর বেশ হতভম্ব মেরে গেছে। বয়সে অত বড় ভগ্নীপতিকে ঠাট্টা করার সাহস নেই, অতটা বুদ্ধির দৌড়ও হয়নি। ভাগ্নীটিকে ভালবাসে। তার বিপদে ভেবেচিন্তে একটা সমাধান করেছে মাত্র, স্নেহশীল মামার সরল বিশ্বাসেই। সবাই উঠে গিয়ে বারান্দা খালি হলে, বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "রাগ করলে নাকি মেজোদাদু?" পিঠে হাত দিয়ে উত্তর দিলাম, "না, রাগ করলে কেউ হাসে? তুমি খেলোগে যাও।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ভোলা

বীরেশ ঘটক

মানিক যেন হাঁটু মুড়ে হাড়িকাঠের পাশে খাঁড়া উঁচিয়েই বসে থাকে। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বুক-কাঁপানো বিবরণ বা সদ্য-বলা কোনো জ্যান্ত ভূতের গল্প শোনার পরেই মানিকের যুক্তির খাঁড়া হাড়িকাঠে আটক ভূতকে ঘচাং! কোনোদিক দিয়েই যেন পার পাবার উপায় নেই। ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানো, এমনকী, ব্রহ্মদত্যির কথা উঠলেও মানিক এমন সব জুতসই যুক্তি হাজির করে, যা প্রায় অকাট্য।

আমরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারতাম না ওর সঙ্গে। মাঝে-মাঝে ভীষণ রাগ বা বিরক্তিও হত ওর অবিশ্বাসের বহর দেখে। আমরা ভাবতাম, এমন লোকও আছে, যারা যুক্তির জোরে ভূত আর ভগবানকে অস্বীকার করে।

দেবু হঠাৎ আমাদের মধ্যে একটা পাঁচ টন ওজনের বোমা ফাটাল। বোমাটা অবশ্য পরমাণু নয়, কিংবা ঘরে তৈরি পেটোও নয়। স্রেফ কাগুজে! মানিকের এক সুদীর্ঘ চিঠি।

প্রায় মাস-ছয়েক হল মানিক চাকরি নিয়ে চলে গেছে। বি· ডি· ও· অফিসের ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। কাটোয়ার দিকে কোথায় যেন।

আমাদের মধ্যে আবার দেবুটারই একটু-আধটু লেখালেখির অভ্যাস আছে। আগে মুখে-মুখে ছড়া কাটত। এখন পদ্য-টদ্য ছাড়াও মাঝেমধ্যে নাকি গপ্পে-টপ্পেও হাত পাকাচ্ছে। লেখার নাম শুনলে তক্ষুনি আমার গায়ে একশো সাড়ে-সাত ডিগ্রি জ্বর এসে যায়। আর অঞ্জনের তো কথাই নেই। ওর নাকি হাতের আঙুলগুলোতে সাড় থাকে না। মনো এক লাইন লিখতে গেলে সওয়া তিনগণ্ডা বানান-ভুল করে বসে। আর বিশ্বর কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল।

অগত্যা দেবুর নামেই আসে মানিকের চিঠি। তাতে সব বন্ধুদের খবরাখবর ও নেয় এবং নিজের খবরও দেয়। দেবু ছাড়া আর কেউ যে ওকে চিঠি দেয় না, তা নিয়ে ওর কোনো অভিযোগও নেই।

মানিক লিখেছে :

প্রিয় দেবু,

আবার বাসা বদলালাম। নামমাত্র ভাড়া। প্রায় নিজের বাড়ির মতই ব্যবহার করছি। কারণ আর কেউ এখানে থাকে না. একমাত্র ভোলা ছাড়া। সাকুল্যে একখানা বড়মাপের ঘর। আসলে এটা একটা অসমাপ্ত বাড়ি। মস্ত বাগানের ভেতরে ঘরখানা। বাড়িটা বেশ পুরনো। ইলেকট্রিসিটি নেই। কুয়ো আছে। দেয়ালে প্লাস্টার নেই মেঝে পাকা। অবশ্য অন্য কোনো অসুবিধা নেই।

এ-বাসায় আসার আগে আমার সহকর্মীরা বা গ্রামের লোকজন এখানে একা থাকতে প্রচণ্ড নিষেধ জানিয়েছিল। কারণ বাড়িটা নাকি প্রথম থেকেই ভূতের দখলে। তোরা তো ভাল করেই জানিস. আমি ও-বিষয়ে চূড়ান্ত অবিশ্বাসী। আমার অবিশ্বাসের বহর দেখেই হোক, কিংবা কোনো অজানা কারণেই হোক, আজ অবধি তিনি আমাকে দেখা দেননি। তোরা তো আবার চূড়ান্ত বিশ্বাসী। তাই যদি তোদের দেখার বাসনা থেকে থাকে, তবে এখানে চলে আসবি। থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। তবে আসবার আগে আমাকে অবশ্যই চিঠি দিস। অফিসের কাজে আমাকে যখন-তখন বাইরে যেতে হয়।

যে-কথা বলতে ভুলেছি, তা হল, অন্য যে বাসিন্দাটি এখানে থাকেন বিনা ভাড়াতেই সেই ভোলা, দেশী জাতের এক চমৎকার কুকুর। মিশকালো রঙের মধ্যে কপালে একটা সাদা গোল ফুটকি। বেশিরভাগ

সময়ই ও খুব ছটফটে এবং প্রাণচঞ্চল। ক্বচিৎ-কদাচিৎ খুবই মুষড়ে পড়ে থাকে ভোলা। জানি না কী কারণে। একেবারে নিস্তেজ, নিঃসাড়। লোকশ্রুতি, অশরীরী আত্মা নাকি তখন ওর ওপর ভর করে। কিন্তু অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা আমি দেখিনি। এ-কথা অবশ্য গ্রামের সবাই জানে।

ভোলাকে এক ধরনের ভয় মেশানো সমীহ করে গ্রামের লোকজন। আমি এ-বাসায় আসার আগেও ভোলা এখানেই থাকত। উদরপূর্তির প্রয়োজনে তখন ও শুধু দিনে দুবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। কিন্তু ওর স্বভাবে কোনো রকমের হ্যাংলাপনা নেই। এক বাড়িতে একই দিনে ভোলা কখনও দু'বার যায় না। কোনো বাড়িতে ঢুকে একপাশে চুপ করে দাঁড়াতে দেখলেই সে-বাড়ির লোকজন ভোলাকে খেতে দেয়। এটাই এ-গ্রামের অলিখিত নিয়ম ছিল। আমি এখানে আসবার পর থেকে অবশ্য ভোলাকে আর বাড়ির বাইরে যেতে হয় না।

আর সব খবর ঠিকঠাক। খুব কাজের চাপ। জবাব দিস। তোদের আসার আশায় রইলাম।

মানিক

মানিকের চিঠি বরাবরই একটু দীর্ঘ হয়। অফিসের কাজকম্ম, রান্না, খাওয়া ছাড়া ওর আর কোনো কাজ নেই বলেই ও হয়তো দীর্ঘ চিঠি লেখে।

চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়ে দেবু প্রশ্ন-চোখে আমাদের দিকে তাকাল।

আমরা যখন স্টেশনে নামলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ছোট্ট স্টেশন। প্লাটফর্মের দুপাশে লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়ামাথা গাছ। দোকান, বাজার, লোকালয়, সবই রেল লাইনের পুব পাশে। পশ্চিম পাশটায় মাঠ। যদিও দিগন্তবিস্তৃত নয়।

"আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে," অঞ্জন বলল।

"আমারও।" যোগ করল বিশ্ব।

"তোরা সারাদিন অত খাই-খাই করিস কেন বল্ তো?" দেবুর গলায় অভিভাবকের সুর।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রিকশার ভিড়। তার সঙ্গে হাঁকডাকও। মোড়ের পানের দোকানের আয়নায় প্রতিফলিত মুখটা দেখে আমরা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। "আরে মানিক!"

মানিক মিটমিট করে হাসছে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "কী রে, তোরা এভাবে না জানিয়ে?"

"তোকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে।" বলল দেবু।

একগাল হেসে মানিক বলল, "পথে তোদের কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

আমরা হৈ-হৈ করে একসঙ্গে জবাব দিলাম, "না-আ-না। কোনোই অসুবিধে হয়নি।"

"তোকে আর ফর্মালিটি দেখাতে হবে না। এখন জলদি চ' তোর ডেরায়," দেবু বলল। "সকলেরই খুব খিদে পেয়েছে।"

"তাহলে এক কাজ করা যাক। এখান থেকে কিছু জলখাবার কিনে নেওয়া যাক। কী বলিস তোরা?"

"এ-সব ব্যাপারে তুই যা ভাল বুঝিস, তাই করবি। এখানে আমরা তোর গাইডেন্সেই চলব।" অঞ্জনের কথা।

কিছু মুড়ি, ঠোঙাভর্তি গরম তেলেভাজা আর আধ-কিলোটাক মাখা-সন্দেশ। ওখানকার মাখা সন্দেশ নাকি খুবই স্বাদু। রেললাইন পেরিয়ে মানিকের সঙ্গে আমরা মাঠের পথে পা বাড়ালাম।

আমরা সবাই খুব খোশ-মেজাজেই হাঁটছিলাম মাঠের পথ

প্রতিটি স্যুইট খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!

বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!

নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার

nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর স্যুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ. প্র.

ধরে। খোলামেলা পা ফেলছে সবাই। ছোট্ট মাঠ পেরোতেই পাকা রাস্তা। মানিক বলল, "কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের এই হল প্রধান সড়ক। আমাদের আর খুব বেশি দূর যেতে হবে না। তোরা ক্লান্ত হচ্ছিস না তো ? হাজার হোক শহুরে ছেলে তোরা।"

"ছ-মাস গ্রামে থেকেই তুই দেখছি মাতব্বর বনে গেছিস।" মনো ফোড়ন কাটে।

কথায়-কথায় আমরা গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। সামনেই মস্ত বড় এক বাগান। আম-লিচু-জাম ছাড়াও অচেনা কিছু বড়-বড় গাছ। মানিকের চিঠির বর্ণনার সঙ্গে মেলানো যেন সব কিছু।

কেমন যেন একটা স্যাঁতসেঁতে ভয়-মেশানো গোটা পরিবেশ। কিন্তু আমাদের খুব একটা অস্বস্তি লাগছিল না। মানিক আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। ও তো একাই এখানে বাস করছে বেশ কিছুদিন।

গ্রামের সন্ধ্যা যেন একটু তাড়াতাড়িই নেমে আসে। ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে আমরা বাগানের পথ ধরে ঘরে পৌঁছলাম।

"তোরা কুয়োতলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে মুড়ি-তেলেভাজা, মাখা-সন্দেশের সদ্‌গতি কর," মানিক বলল, "আমাকে একটু আধঘণ্টার জন্যে যেতে হবে বি· ডি· ও· সাহেবের বাংলোয়। খুবই জরুরি কাজ।"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করছি। সকলেরই মনোভাব, আজকে কি না-গেলেই নয়।

মানিক বেরিয়ে যেতেই আমরা পোশাক পালটে মুখ-হাত-পা ধুয়ে মেঝেয় কাগজ পেতে গোল হয়ে বসে পড়লাম। মুড়ি-তেলেভাজা আর মাখা-সন্দেশের মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করেছে সবাই। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কেবল মুচ-মুচ শব্দ। কথা বলে কেউই যেন ফাঁকি পড়তে রাজি নয়। হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ শব্দে চোখ কপালে তুলে মুড়ি-মুখে চারটি কিম্ভূত আওয়াজ বার হল একসঙ্গে, "ভোলা" !

সত্যি বলতে কী, এতক্ষণ আমরা ভোলার অস্তিত্বের কথা ভুলেই ছিলাম। বারান্দার কোণে বুক-পেট পেতে শুয়ে আছে ভোলা। বড় বেশি জীবন্ত যেন ওর চোখ দুটো। আমরা ভেতরে ঢোকার সময় ভোলাকে কিন্তু দেখিনি।

ভোলাকে তোয়াজে রাখতে সবাই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। নিজেদের খাবার প্রতি যে গভীর মনোযোগ এতক্ষণ আমাদের ছিল, তা যেন এক নিমেষে উবে গেল। আমরা বেশ সমীহ করে চলতে লাগলাম।

মুড়ি-তেলেভাজা আর মাখা-সন্দেশ দেওয়া হল ভোলাকে। সবাই ওকে খুশি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল মানিক। ও যেন জীবনে এই প্রথম ভূত্ দেখল ! গোল-গোল চোখে ও বলে গেল, "তোরা কখন এলি ? আমার বাসা চিনলি কেমন করে ? স্টেশন থেকে তোদের পথ দেখিয়ে আনলই বা কে ? ঘরের চাবিই বা তোরা পেলি কোথায় ?"

মানিক দ্রুত হাতে পকেট হাতড়াতে লাগল।

"তাই তো, তবে কি আমি চাবি ফেলে গিয়েছিলাম ! হবেও বা, তোরা সেটা পেলি কার কাছে ?"

ফ্যালফেলে চোখেও আমাদের প্রত্যেকেরই ভ্রূ কুঁচকে উঠল প্রশ্নের ভাঁজে। কী, বলছে কী মানকেটা !

"এখানে ছ'মাস থেকেই যে তুই অভিনয়কলাটাও ভালভাবে রপ্ত করেছিস, তা তো জানা ছিল না।" ব্যঙ্গ মেশানো গলায় অঞ্জন উচ্চারণ করল।

মনো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মানিক বলল, "তার মানে ?"

"মানে অতি সোজা। স্টেশনের মোড়ের পানের দোকানের সামনে তোর সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা।"

"আমার সঙ্গে ?" মানিকের গলায় রাজ্যের বিস্ময়।

"নয়তো কী ! তোকে সারপ্রাইজ না দিতে পারার জন্য আমরা প্রত্যেকেই মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলাম। যাক্ সে কথা। তুই জিজ্ঞেস করলি, আমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা," দেবু বলতে থাকল, "বাজার থেকে মুড়ি, তেলেভাজা, মাখা-সন্দেশ কিনে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলি তোর ঘরে। এত কাণ্ডের পর এখন বলছিস্, তোরা কখন এলি, চাবি কী করে পেলি !" হোহো করে হেসে উঠলাম আমরা সবাই।

"কী বলতে চাইছিস তোরা !" মানিকের গলা চিরে বেরিয়ে এল কথাটা।

"আমরা তো ঠিকই বলছি," আমি বললাম, "দেবু যা-যা বলল, এ-সবই তো ঠিক। তুই নিজেই আমাদের পৌঁছে দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে বি-ডি-ও সাহেবের বাংলো থেকে ঘুরে আসবি বলে বেরুলি।"

"কী যা-তা বকছিস ?" মনো চার্জ করল।

অঞ্জন চোখ মটকে হাসতে হাসতে বলল, "সে কী রে, তোকে আবার ভূতে পেল নাকি !"

"দেখিস বাবা ! অজানা অচেনা জায়গা। ওঝা-বদ্যিই বা আমরা পাব কোথায় !" মনো যোগ করল।

মানিক কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, "ঝটপট পোশাক পরে তৈরি হয়ে নে তোরা। এখুনি একবার বেরোতে হবে।"

প্রায় সাত-আট মিনিট হেঁটে আমরা একটা বাংলো ধরনের বাড়ির সামনে হাজির হলাম। আমাদের উচ্চকণ্ঠ আলোচনা চলছিল নিজেদের মধ্যে। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। "বি· ডি· ও· সাহেব," নিচু গলায় আমাদের বলল মানিক।

"কী ব্যাপার মানিকবাবু, এঁদের সঙ্গে করে এনেছেন ?"

"এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন, স্যার। আমার বন্ধুবান্ধব।"

"ও, যাদের কথা আপনি সব সময় বলেন। সেই ভূতবিশ্বাসী... কিন্তু আমার এখানে তো এখন আমি ছাড়া আর কোনো ভূত নেই মানিকবাবু।"

মানিক জিভ কাটে। "স্যার, আমরা একটা দারুণ সমস্যায় পড়েছি। এঁরা বলছেন, আমি নাকি এঁদের স্টেশন থেকে পথ দেখিয়ে আমার বাসায় নিয়ে এসেছি আজ সন্ধ্যায়। আপনি এঁদের বলুন, আজ ক'টায় আপনি আমাকে অফিস থেকে ছেড়েছেন।"

"কেন, সাড়ে ছ'টায়।" বি· ডি· ও· সাহেবের স্থির জবাব।

তাহলে স্টেশন থেকে আমাদের পথ দেখিয়ে আনল কে ?

ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিন

ও হ্যাঁ, টুপিটা হচ্ছে আমাদেরই দলের একজনের। সে-লোকটা গান গায়। নিন, কোট খুলে আরাম করে বসুন।
বসছি, ম্যাডাম।
ইর্মা, কোটটা তুলে রাখো।
এবারে একটু খানাপিনার ব্যবস্থা করো ইর্মা। কর্নেলের অভ্যর্থনায় কোনও ত্রুটি না হয়।
হে হে, কী যে বলেন!
শ্যাম্পেনের বোতলটা আপনিই খুলুন, কর্নেল!
নিশ্চয়! নিশ্চয়!
ঠক্ ঠক ঠক
আসুন।
ক্ষমা করুন কর্নেল, সেই দুই বিদেশীর খোঁজে আমরা এখানে এসেছি ...
বটে?
এখানে তাদের খোঁজ কীভাবে পাবে? যাও, বেরোও, দূর হও! এক্ষুনি আমি রাগে ফেটে পড়ব!
ফট
ওরা আসলে দুই গুপ্তচরকে খুঁজছে!
গুপ্তচর? বলেন কী কর্নেল?
ব্যাটা মিথ্যুক!
আসলে কী জানেন, বিদেশী এক বিজ্ঞানীকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি এক দারুণ অস্ত্র উদ্‌ভাবন করেছেন। সেটা পেলে আমরা বিশ্বজয় করব।
বটে?
হ্যাঁ, কিন্তু এই বিজ্ঞানী তাঁর অস্ত্রটাকে যুদ্ধে লাগাতে দিতে চান না। বুঝুন ব্যাপার!
অর্থাৎ বোকা বিজ্ঞানী!
ভীষণ বোকা! আমরা তাই তাঁকে বাখিন দুর্গে বন্দী করে রেখেছি। নকশাটা দিলে তবে তাঁকে ছাড়ব!
না-দিয়ে যাবে কোথায়!
বলেছি তো, দিলে তবেই ছাড়ব! ছেড়ে দেবার অর্ডারটা আমার কোটের পকেটেই রয়েছে!
কিন্তু দেশে ফিরে লোকটা যদি সব কথা ফাঁস করে দেয়?

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে হরিবাবুর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ। সে নাকি বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল, শিবুবাবুকে সে সূক্ষ্ম পিস্তল দিয়ে তিন-তিনটে কালাসাহেবকে খুন করতে দেখেছে। তাঁর তৈরি আকাশী জামা পরে শূন্যে ঘোরা যেত। শেষ পর্যন্ত তিনি ওলন্দাজের হাতে মারা যান। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু কালোয়াতি গান করেন। দুজনকেই সে ভূতের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু জরিবাবু যখন বলেন যে, সত্যি তিনি ভূতের ধাক্কা খেয়েছেন, উটকো লোকটা তখন নিজেই যেন ঘাবড়ে যায়। তারপর···

হরিবাবুর বড় দুই ছেলের নাম হল ঘড়ি আর আংটি। পোশাকি নাম অবশ্য আছে, সেটা কেবল স্কুলের খাতায়। দুজনেই অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির দুষ্টু। সামলাতে সবাই হিমশিম।

ছুটির দিনে আজ দুজনেই গিয়েছিল জেলা স্কুলের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে। দু' ভাইয়ের আর তেমন কোনও গুণ না থাকলেও তারা খেলাধুলোয় খুবই ভাল। তল্লাটে খেলোয়াড় হিসেবে দুজনেরই বেশ নামডাক। হরিবাবু অবশ্য খেলাধুলো পছন্দ করেন না। তিনি কবি মানুষ এবং মনে প্রাণে কবি বলেই বোধহয় এসব স্থূল খেলাধুলোকে তাঁর ভারী ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। ফুটবলের নাম শুনলে তিনি আঁতকে উঠে বলেন, "বর্বরতা! ফুটবল মানেই হচ্ছে গুঁতোগুঁতি ল্যাং-মারামারি, টুঁসোটুঁসি, বর্বরতা।" ক্রিকেটের কথা শুনলে নাক সিঁটকে বলেন, "কে যেন বলেছে ক্রিকেট হল উইলো কাঠের কবিতা! ছ্যাঃ, সে-লোকটা কবিতার ক-ও বোঝে না। ডাংগুলি, স্রেফ ডাংগুলি, সাহেবরা মান বাঁচাতে নাম দিয়েছে ক্রিকেট।"

বলা বাহুল্য হরিবাবু দৌড় ঝাঁপ লাফালাফিও পছন্দ করেন না। তিনি চান সকলে সব সময়ে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকুক। চেঁচামেচি ঝগড়া কাজিয়া না-করুক। কথা কম বলুক। আরও বেশি করে ভাবুক। কবিতা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে ভালবাসেন না। কপালদোষে তাঁর বড় এবং মেজো ছেলে ঘড়ি আর আংটি স্বভাবে হয়েছে বিপরীত। দুটোই দুর্দান্ত বর্বর।

হরিবাবুর বড় ছেলে ঘড়ি খুবই ভাল ব্যাটসম্যান। আংটি বোলার। ফুটবলও তারা খুবই ভাল খেলে। দৌড়ঝাঁপেও কম যায় না। বিনোদবিহারী হাইস্কুল যে জেলার মধ্যে খেলাধুলোয় সেরা, তা এই দুজনের জন্যই।

জেলা স্কুলের সঙ্গে বিনোদ হাই-এর রেষারেষি অনেক দিনের। এ-বছর কলকাতা থেকে তিন-চারটি টাটকা খেলোয়াড় ছেলে এসে ভর্তি হওয়ায় জেলা স্কুলের জেল্লা বেড়ে গেছে। জেলা ক্রিকেট লিগে তারা ইতিমধ্যেই প্রায় সব স্কুলকে গো-হারা হারিয়ে দিয়েছে। আশিস রায় নামে তাদের একজন পাকা ব্যাটসম্যান আছে। দেবর্ষি ভট্টাচার্য দুরন্ত ফাস্ট বোলার, একজন গুগলিবাজও আছে—মদন মালাকার। তিনজনেরই দারুণ নামডাক। কলকাতায় এরা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলত

জেলা স্কুলের ক্যাপটেন আশিস টসে জিতে ব্যাট নিল।

বিনোদ হাই-এর ক্যাপটেন ঘড়ি তার দলকে প্যাভিলিয়নের সামনে জড়ো করে বলল, "জেলা স্কুলের প্রধান ভরসা আশিস। সে নামবে ওয়ান ডাউন। ওদের ওপেনার নাড়ু আর গণেশের মধ্যে গণেশটা গেঁতো, সহজে আউট হবে না। সুতরাং আমরা কনসেনট্রেট করব নাড়ুর ওপর। তাকে চটপট ফেলে আশিসকে মুখোমুখি এনে ফেললেই আসল লড়াই শুরু হবে। মনে রেখো, আশিসের অফ সাইড স্ট্রোক ভাল নয়। আংটি, তুই অফ স্টাম্পে বা অফ স্টাম্পের বাইরে বল দিবি। জ্যোতি, তুইও অ্যাটাক করবি অফ স্টাম্প। ক্যাচ যেন আজ একটাও মাটি না ছোঁয়।"

বিনোদ হাই-এর লেখাপড়ায় নাম না থাকলেও খেলায় খুব সুনাম। তাই মাঠ ভেঙে পড়েছে লোকে। লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের এইটাই চূড়ান্ত খেলা। যে জিতবে, সে-ই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। কাজেই উত্তেজনা স্বাভাবিক।

প্রবল হাততালির মধ্যে নাড়ু আর গণেশ ব্যাট করতে নামল। গণেশ প্রথম বোলারের মোকাবিলা করবে। ঘড়ি একটু ভেবে বলটা জ্যোতির হাতে দিয়ে বলল, "প্রথম ওভারটা তুই-ই কর। বেশি জোরে বল করার দরকার নেই। লেংথটা রেখে যাস। গণেশ রান নেবে না, শুধু বাঁচিয়ে যাবে।"

তাই হল। জ্যোতি গুড লেংথে মিডল স্টাম্প লক্ষ করে বল দিয়ে গেল। তার তিনটে বল ছিল ইন-সুইঙ্গার। গণেশ দেখে দেখে প্রতিটি বল ব্লক করে গেল।

দ্বিতীয় ওভার বল করতে এল আংটি। তার বলে জোর বেশি, বৈচিত্র্যও বেশি। দু'রকম সুইং আছে তার হাতে, তার ওপর মাঝে-মাঝে অফকাটার বলও দিতে পারে। নাড়ু একটু ছটফটে ব্যাটসম্যান। মারকুট্টা বলে সে দ্রুত রান তুলে দেয়। আবার আউটও হয় চটপট।

আংটি আজ উত্তেজনাবশে প্রথম বলটাই লেংথে ফেলতে পারল না। একটু ওভারপিচ হয়ে গেল। নাড়ু দেড় পা এগিয়ে এসে সেটাকে মাটিতে পড়ার আগেই লং অফ দিয়ে চাবকে বাইরে পাঠাল। চার। প্রবল হাততালি।

দ্বিতীয় বল করতে গিয়ে আংটি বলটা ফেলল গুড লেংথে, তবে লেগ স্টাম্পের বাইরে সোজা বল। নাড়ু একটা চার মেরে গরম হয়ে ছিল। বলটাকে ব্যাকফুটে সরে গিয়ে হুক করল। আবার চার।

ঘড়ি এগিয়ে এসে আংটিকে বলল, "লোপ্পা বলই দিয়ে যা। এবার শর্ট পিচ, লেগ স্টাম্পের বাইরে। আমি দেবুকে ডিপ ফাইন লেগে রাখছি। ও ক্যাচ ফেলে না।"

আংটি দাদার নির্দেশমতো লেগ স্টাম্পের বাইরে শর্ট পিচ

বল দিল। যে-কোনও ব্যাটসম্যানের কাছে এর চেয়ে লোভনীয় বল আর নেই। নাড়ু ব্যাকফুটে সরে গিয়ে বলটাকে স্কোয়ার লেগ দিয়ে বুলেটের গতিতে চালিয়ে দিল। আবার চার, এবং ক্যাচ উঠলই না।

আংটির মতো সাঙ্ঘাতিক বোলারের প্রথম তিন বলেই তিনটে চার হওয়ায় মাঠে রীতিমত উত্তেজনা। জেলা স্কুলের সমর্থকদের হাততালি আর উল্লাস থামতেই চায় না।

চতুর্থ বলটা করার আগে আংটি একটু ভেবে নিল। আবার একটা লোপ্‌পা বল দিলে নাড়ু যদি আবার চার মারে, তা হলে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠবে তার পক্ষে।

তবু দাদার নির্দেশ সে ফেললও না। ঘড়ি ক্যাপটেন হিসেবে খুবই ভাল। স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারির কাছ-বরাবর সে আর-একজন ফিল্ডারকে টেনে এনেছে।

আংটি দৌড় শুরু করল এবং বেশ ধীরগতির শর্ট পিচ বলটা ফেলল আবার লেগ স্টাম্পের বাইরে। বলটা সামান্য উঠল। নাড়ুকে পায় কে। ব্যাকফুটে সরে গিয়ে সে বলটাকে সপাটে আকাশে তুলল ছয় হাঁকড়াতে।

বলটা ছয় হয়েই মাঠের বাইরে পড়ছিল। কিন্তু স্কোয়ার লেগ-এর ফিল্ডার মোহন বিশাল লম্বা। হাতে পায়ে ভীষণ চটপটে। নাড়ুর ছয়ের মার যখন সীমানা ঘেঁষে নেমে আসছিল, সে তখন শুধু পা দুখানা মাঠের ভিতরে রেখে লম্বা হাত বাড়িয়ে শূন্যেই বলটা নিঃশব্দে লুফে নিল। মাঠটা হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল এই ঘটনায়। তারপর তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ল বিনোদ হাই-এর সমর্থকরা।

আশিস যখন এসে গার্ড নিল, তখন তার মুখে কোনও উদ্বেগ নেই। আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করছে সে।

ঘড়ি এগিয়ে এসে আংটিকে বলল, "এবার ঠিক করে বল দে। গুড লেংথ, অফ স্টাম্পের ওপর।"

আংটি তার স্বভাবসিদ্ধ দৌড় শুরু করল এবং দুর্দান্ত জোরে শরীর ভেঙে বলটা করল। গ্রিপ-এ কোনও ভুল ছিল না। বলটা বাতাস কেটে ইনসুইং হয়ে গুড লেংথে পড়ে অফ স্টাম্পে ছোবল তুলল। এ বল ব্যাটসম্যানকে খেলতেই হয়। ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। এল বি ডবলিউ বা বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনা।

আশিস বলটাকে সোজা ব্যাটে খেলল।

খেলল, আবার খেললও না। কারণ বলটা ছিল কোনাচে। যতখানি ফ্রন্টফুটে এগোনো দরকার ছিল, আশিস ততটা এগোনোর সময় পায়নি। কারণ সে প্যাভিলিয়নে বসে দেখেছে, আংটি বল ফেলছে লেগ স্টাম্পের বাইরে। সুতরাং সে-রকমই আশা করেছিল। আচমকা অফ স্টাম্পের বল তাকে কিছুটা অপ্রস্তুত করেছিল বোধহয়।

আটকানোর জন্য বাড়ানো ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বলটা স্লিপের দিকে ছিটকে গেল। মাত্র ছ' ইঞ্চি উঁচু হওয়া সেই বলটা একটু নিচু হয়ে ঘড়ি তুলে নিল চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে।

এক ওভারে দুই উইকেট পাওয়া আংটি একটু হাসল।

পরের ব্যাটসম্যান রঘু। ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। অনেকটা গণেশের মতোই। তবে প্রথম কয়েক ওভার সে আনতাবড়ি খেলে, সেট হতে সময় নেয়।

ঘড়ি আংটির কানে-কানে বলে গেল, "মিডল স্টাম্পে বল

রাখিস। ইয়র্কার গোছের।"

আংটি মাথা নাড়ল। ঠিক আছে।

ওভারের শেষ বলটায় উইকেট পেলে হ্যাট্রিক হবে। কিন্তু হ্যাট্রিকের চিন্তা মাথায় থাকলে বলটা ঠিকমতো দেওয়া যাবে না। তাই আংটি মনে-মনে দাদুর ল্যাবরেটরির ভূতটার কথা ভাবতে ভাবতে রান আপ করতে গেল।

হ্যাঁ, তার দাদুর ল্যাবরেটরির ভূতটাকে সে বেশ কয়েকবার দেখেছে। লম্বামতো, জোব্বা পরা। গভীর রাতে ল্যাবরেটরির ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করে। দাদু নিজেই নয় তো!

শেষ বল। আংটি দৌড় শুরু করল। তার রান আপ একটু কোনাচে, সে দৌড়য় সহজ সাবলীল মসৃণ গতিতে। ডান হাতটা দোল খায়।

দৌড়ে এসে বলটাকে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে পায়ে ব্রেক কষল আংটি। বলটা পড়ল ওভারপিচে। ব্যাটের তলায়। তারপর ইঁদুরের মতো ব্যাট পিচের ভিতরের ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে গলে গিয়ে মিডল স্টাম্পকে মাটিতে শুইয়ে উইকেট কিপার শম্ভুর হাতে গিয়ে জমা হল।

হট্টগোলে কানে তালা লাগবার উপক্রম। বিনোদ হাই-এর কয়েকজন সমর্থক মাঠে ঢুকে আংটিকে কাঁধে নিয়ে খানিক নাচানাচি করে ফিরে গেল। এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। আংটি আর জ্যোতির দু'মুখো ধারালো আক্রমণে জেলা স্কুল বাষট্টি রানে গুটিয়ে গেল। আংটি কুড়ি রানে সাত উইকেট নিল। দুটি জ্যোতি। একজন রান আউট।

ঘড়ি সাধারণত ওপেন করে না। আজ করল। ইচ্ছে করেই। দেবর্ষির প্রথম ওভারটা তাকেই খেলতে হবে। মনোবল যদি ভাঙতে হয়, তবে প্রথম ওভারেই। মার পড়লে বোলারের বল ঢিলে হয়ে যায়।

গুনে গুনে পাঁচটা বাউণ্ডারি মারল ঘড়ি। লেট কাট, কভার ড্রাইভ, অফ ড্রাইভ, অন ড্রাইভ, আর একটা অফ স্টাম্পের বল অফ-এর দিকে সরে গিয়ে স্কোয়ার লেগ-এ হুক।

মাত্র আট ওভারেই বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে নিল বিনোদ হাই। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

Amela—5 (3.4.85)

রোভার্সের রয়
স্যাম বার্লোর নিষেধ সত্ত্বেও মাঠে নেমে ওয়ালফোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলছে রয়। হাফ-টাইমে স্যামের সঙ্গে সে বোঝাপড়া করতে এসেছে…
ক্লাবের চেয়ারম্যান এবারে রয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে !
উরেব্বাবা !
রয় মুশকিলে পড়বে !
ROVERS
ROVERS
ROVERS
ROVERS
কিছুক্ষণ বাদে…
কী ব্যাপার রয় ? কিছু বলবে ?
আমি কী বলব ?
আপনি বলুন !
ভেবেছিলুম, তোমার বাঁ পা জখম, তাই খেলতে নিষেধ করেছিলুম !
না না, আপনি ভেবেছিলেন, বিপত্তির মূলে রয়েছে স্কোয়াশ !
তাতে কী হয়েছে ?
হয়েছে এই যে, শরীর ফিট রাখবার জন্যে ডাক্তারই আমাকে ব্যায়াম করতে বলেছিলেন।
কী রকম ব্যায়াম ?
লকার খুলল রয়…
এক্ষুনি দেখাচ্ছি…
স্কোয়াশের র‍্যাকেট ?
এইজন্যেই বিপত্তি ঘটেছিল ?
স্যামের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল…
সত্যি বলছ ?
হুররে !
চেয়ারম্যানকে মিথ্যে বলব ?
রয় সত্যি বলছে, স্যাম !

ঠিক আছে। কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে আছে তো ?
সক্কলের মনে আছে।
আমরা সব্বাই সেজন্যে জান লড়িয়ে দেব !
শুরু হচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা...
রয় বলেছে. আমরা লিগ জিতব...
অতএব জিতবই !
কয়েক মুহূর্ত বাদে...
গোল চাই !
হবে না !
দু' গোলে পিছিয়ে আছি, কিন্তু...
তা শোধ করে দেব !
উঃ !
কে শোধ করবে ?
উড়ে এসে জিমি তৃতীয় গোল করল !
রোভার্স ৩, ওয়ালফোর্ড ০
চতুর্থ গোল রয়ের হেড থেকে ডানকান...
বলটা একেবারে পায়ে পৌঁছে দিল !
তারপর কর্নার কিক থেকে...
রয় ! রয় !
পাঁচ গোল !
বাপ রে, কী খেলা !
খারাপ খেলছি না...অথচ...
পাঁচ গোলে হারছি !
রোভার্স আজ খেপে গেছে !
খেলা শেষ। শেষ খেলায় এক পয়েন্ট পেলেই লিগ পাবে রোভার্স...
স্যাম, একটা বোনাস দিতে হবে !
বোনাসের চেয়ে বেশি দেব !
দরকার হলে নিজের গাঁট থেকে দেব !
শেষ খেলা থেকে সেই একটা পয়েন্ট কি পাওয়া যাবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টোপলজি ও তার কয়েকটি বিখ্যাত সমস্যা

সুজন দাশগুপ্ত

সাধারণভাবে জ্যামিতি ও ঘনজ্যামিতির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় প্রায় অনেকেরই রয়েছে। জ্যামিতির বিষয় হল বিন্দু, সরলরেখা; ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন আকারগুলির বৈশিষ্ট্য ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা। ঘনজ্যামিতির কারবার হল ঘনবস্তু নিয়ে। কিন্তু অনেকের হয়তো জানা নেই যে, আধুনিক জ্যামিতির আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে এবং তাদের মধ্যে একটির নাম হল টোপলজি। জ্যামিতির কোনও ফিগার নিয়ে সেটাকে দোমড়ানো, মোচড়ানো, টানা-হ্যাঁচড়া ইত্যাদি করার পরও তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে, সেগুলোই হচ্ছে টোপলজির আলোচ্য বস্তু। সাধারণভাবে আমরা জানি—ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত এগুলো সব আলাদা-আলাদা আকারের। কিন্তু টোপলজির পণ্ডিতের কাছে সেগুলো সবই এক ! তার কারণ যদি ধরা হয় যে, রেখামাত্রই যেরকম খুশি বাঁকানো চলে, তাহলে একটা থেকে অন্যটা সহজেই তৈরি করা যায়। শুনে হয়তো মনে হবে, বিষয়টা ভারী গোলমেলে, গণিতজ্ঞ না হলে এ-নিয়ে কোনও দিনই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে, আমরা অনেক ধাঁধা বা সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করি যেগুলো আসলে হল টোপলজির সমস্যা !

টোপলজির একটা সুপরিচিত সমস্যা হল পাঁচটি চতুর্ভুজ নিয়ে। পাঁচটি চতুর্ভুজ (১ (অ) ছবি দ্রষ্টব্য) এমনভাবে আঁকতে হবে যে, আঁকার সময় কেবলমাত্র পেন্সিলের তিনটে আঁচড় ব্যবহার করা চলবে, অর্থাৎ কাগজ থেকে পেন্সিল তিনবারের বেশি ওঠানো চলবে না। শুধু তাই নয়, একবার আঁকা-লাইনের ওপর দ্বিতীয়বার পেন্সিল বোলানো চলবে না। এখন নিশ্চয় প্রশ্ন জাগবে যে, এর সঙ্গে টোপলজির সম্পর্ক কী ? সম্পর্ক হল এই যে, ১ (অ) ছবির যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সমস্যাটার সৃষ্টি হয়েছে সেটা চতুর্ভুজের আকার বা আয়তনের ওপর নির্ভর করছে না। যদি চতুর্ভুজের রেখাগুলোকে দুমড়ে ফেলে ১ (আ) ছবির মতো করে ফেলা হয়, সমাধানের ব্যাপারে তাতে কিছুই সুবিধা বা অসুবিধা হবে না।

এবার চিন্তা করা যাক, সমস্যাটার সমাধান কী ? একটা উপায় হচ্ছে—হাতে-কলমে চেষ্টা করে দেখা। মুশকিল হল,

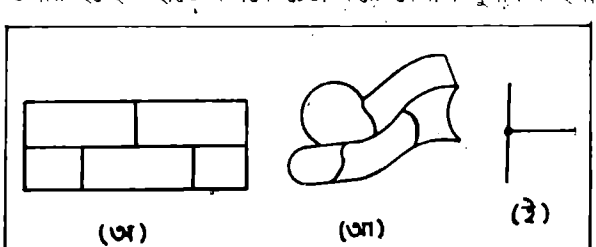

১ নং ছবি

যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, উত্তর কিছুতেই মিলবে না। কারণ, এর কোনও সমাধান নেই। এটা যদি আগে জানা থাকত, তাহলে কেউই খামোখা চেষ্টা করত না। প্রশ্ন হল—কী করে জানা যাবে যে, এর কোনও সমাধান নেই। প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। অঙ্কের জগতে সমাধানের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করা সবসময় সহজ নয়। কোনও একটা কাজ করা যায় কি না প্রমাণ করতে সে কাজটা একবার করে ফেললেই হয়। তার মানে এই নয় যে, কাজটা করা সহজ। তবু কোনওমতে একবার করতে পারলেই ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু কোন্ কাজটা করতে পারা যাবে না— সেটা বলা বেশ শক্ত। কারণ, এক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে, যতরকমভাবে চেষ্টা করা সম্ভব তার প্রত্যেকটিই করা হয়েছে, কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি। ক'জন জোর গলায় এই দাবি করতে পারে ? এমনকী অতি সাধারণ সমস্যা, যেমন উল্লিখিত পাঁচটি চতুর্ভুজের সমস্যা—এর সমাধানের চেষ্টাও পেন্সিল দিয়ে বহুরকমভাবে দাগ কেটে করা যেতে পারে। সেগুলির প্রত্যেকটির বিচার করা এবং স্থির নিশ্চিত হতে পারা যে-কোনও সম্ভাব্য চেষ্টাই আর বাকি নেই—মোটেই সহজ কথা নয়। তার ওপর পাঁচের বদলে যদি চতুর্ভুজের সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে তো হিসেব করতে করতে চুল-দাড়ি সব পেকে যাবে !

বলা বাহুল্য, এ-ক্ষেত্রে সমাধানের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করতে অন্য কোনও পথ বাছতে হবে। একটা সহজ পথ আছে, সেটা হল চতুর্ভুজের বিভিন্ন কোণগুলো পরীক্ষা করা। যেখানে শুধু দুটো রেখা একটা বিন্দুতে এসে মিশেছে, সেটা কোনও সমস্যাই নয়—পেন্সিল না তুলে অতি সহজেই সেটা আঁকা চলবে। কিন্তু যদি তিনটি রেখা একটা বিন্দুতে এসে মেশে (১ (ই) দ্রষ্টব্য) তাহলে আঁকার সময় অন্তত একটা লাইন বা আঁচড়ের শেষ সেই বিন্দুতেই হবে। কারণ হল, যদি প্রথমবার দুটো রেখা আঁকার সময়ে বিন্দুর ওপর দিয়ে চলে যাওয়া যায়, তাহলে পরেরবার যখন তৃতীয় রেখাটি আঁকার জন্য বিন্দুতে আবার ফিরে আসতে হবে, তখন যাওয়ার কোনও পথ থাকবে না। এইবার ১ (অ) ছবির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক যে, সেখানে কতগুলো বিন্দু আছে, যেখানে তিনটে রেখা এসে মিশেছে। মোট আটটা। অর্থাৎ এই ছবিতে লাইন বা আঁচড়ের মোট আটটা প্রান্ত বা শেষ আছে। আমরা জানি পেন্সিলের প্রত্যেকটা আঁচড়েরই দুটো করে প্রান্ত। অতএব ছবিটা কখনই চার আঁচড়ের কমে আঁকা যাবে না।

টোপলজির আরেকটি বিখ্যাত সমস্যা হল, কোয়েনিসবার্গের সমস্যা। আধুনিক ইউরোপের ম্যাপে এখন আর কোয়েনিসবার্গকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাশিয়ার এই শহরটির নাম পালটে রাখা হয়েছে কালিনিনগ্রাড। কিন্তু

সমস্যার নামটি বদলায়নি। সমস্যাটির জন্ম হয়েছিল বহুদিন আগে, ঠিক কতদিন আগে—বলা কঠিন। তবে আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে কোয়েনিসবার্গ শহরে সাতটা ব্রিজ ছিল (২(ক) ছবি দ্রষ্টব্য)। সেই সময় কোয়েনিসবার্গবাসীদের একটা মজার খেলা ছিল যে, কীভাবে প্রত্যেকটি ব্রিজের ওপর দিয়ে একবার এবং কেবলমাত্র একবার হেঁটে নিজের বাড়ি ফিরে আসা যায়। যে-কোনও কারণেই হোক, কারও পক্ষেই কখনও সেটা সম্ভব হয়নি। ধীরে-ধীরে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে শুরু করল যে, এটা আদৌ সম্ভব কি না। একদিন কোয়েনিসবার্গবাসীদের এই ছেলেমানুষি খেলার কথা সুইটজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিওনার্ড অয়লারের কানে এসে পৌঁছল। অয়লার কিন্তু খেলাটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অনেক গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। যে সমস্যার সমাধান কোয়েনিসবার্গবাসীরা দিনের পর দিন হেঁটেও করে উঠতে পারেননি, অয়েলার কোয়েনিসবার্গ না গিয়েও কাগজ-পেন্সিলে সেটার বিশ্লেষণ করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ১৭৩৬ সালে সেণ্ট পিটাসবার্গ অ্যাকাডেমিতে তিনি তাঁর গবেষণার ফল পেশ করার সময় জানালেন যে, কেন কোয়েনিসবার্গের ওই সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

অয়লারের মস্ত বড় ক্ষমতা ছিল যে, তিনি সমস্যার অদরকারি অংশগুলোকে চট করে ধরতে পেরে সেগুলোকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে ফেলতে পারতেন। তিনি কোয়েনিসবার্গ শহর আর তার ব্রিজগুলোকে শুধু কয়েকটা বিন্দু আর লাইন দিয়ে এঁকে ফেললেন (২ (খ))। এ ধরনের ছবিকে বলা হয় গ্রাফ। ছবিতে বিন্দুগুলো হচ্ছে স্থল, আর লাইনগুলো ব্রিজ। এবার যদি তিনি পুরো ছবিটার ওপর পেন্সিল বোলাতে পারেন কাগজ থেকে পেন্সিল না তুলে এবং কোনও লাইনের ওপর দ্বিতীয়বার না গিয়ে, তাহলেই কোয়েনিসবার্গের সমস্যার সমাধান হবে। খেয়াল করে দ্যাখো যে, জল বা স্থলের আয়তন বা চেহারা ঠিক কেমন—এ-প্রশ্নের ক্ষেত্রে সেগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন। সেজন্যই এটা হল টোপলজির সমস্যা। অয়লার বিন্দুগুলোর নাম দিলেন নোড়'। একটা নোড়কে জোড় কিংবা বিজোড় নোড় বলা হবে যদি তার সঙ্গে যুক্ত লাইনের সংখ্যা হয় জোড় কিংবা বিজোড়। অয়লার প্রমাণ করলেন যে, কোয়েনিসবার্গজাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে, যদি—

(১) গ্রাফে বা ছবিতে কোনও বিজোড় নোড় না থাকে। (এক্ষেত্রে ছবির যে-কোনও বিন্দু থেকে শুরু করে সেই বিন্দুতেই ফিরে আসা যাবে।)

অথবা (২) ছবিতে শুধু দুটো বিজোড় নোড় থাকে। (এক্ষেত্রে একটি বিজোড় নোড় থেকে শুরু করে অন্য বিজোড় নোডে শেষ করতে হবে।)

এবার যদি কোয়েনিসবার্গের গ্রাফটা পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে চারটে বিজোড় নোড় আছে। সুতরাং সমস্যাটির সমাধান অসম্ভব। প্রসঙ্গত অয়লারের এই গবেষণা থেকেই আধুনিক গণিতের একটি শাখা গ্রাফ-থিয়োরির উৎপত্তি।

এই গ্রাফ আঁকাটা যদি রপ্ত হয়ে যায়, তাহলে অয়লারের নিয়মদুটো ব্যবহার করে অনেক সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সমস্যার

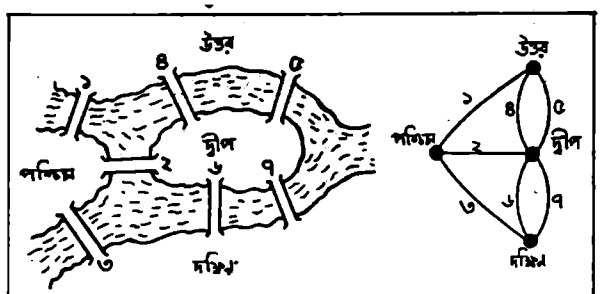

২ নং ছবি

সৃষ্টি তোমরা নিজেরাই করতে পারবে। ৩ নং ছবিতে উদাহরণস্বরূপ কতগুলো সমস্যা দেওয়া হল। ছবিতে তিনটে ঘর ও তাদের সংলগ্ন কতগুলো দরজা দেখানো হয়েছে। সমস্যাটা হল, একজনকে হেঁটে প্রত্যেকটা দরজার মধ্যে দিয়ে একবার এবং কেবলমাত্র একবারই যেতে হবে। কীভাবে সেটা সম্ভব ?

এই সমস্যাগুলো অবশ্য সহজ। কিন্তু অতি সহজেই তোমরা ঘর ও দরজার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে অতি দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারো। এই ধরনের যে-কোনও সমস্যাই অবশ্য সমাধান করা যাবে গ্রাফ এঁকে। এই ছবিগুলো থেকে অয়লারের গ্রাফ তোমরা নিজেরাই আঁকতে পারবে। আলোচনার সুবিধার জন্য ছবির নীচে এই গ্রাফগুলোকেও দেখানো হয়েছে। খেয়াল করে দ্যাখো যে, মোট ঘরের সংখ্যা হল মাত্র তিনটি (ক, খ ও গ)। কিন্তু তিনটে ঘর থেকেই বাইরে বেরুনো যায়। সেই বাইরের জায়গাটাকে বলা হয়েছে 'ঘ'। সেটাকেও একটা বিন্দু হিসেবে দেখানো হয়েছে। দরজাগুলো হচ্ছে এক একটা লাইন। (দরজার নম্বর ও লাইনের নম্বরগুলো মিলিয়ে দ্যাখো।) গ্রাফগুলো পরীক্ষা করে এবং অয়লারের নিয়মদুটো মনে রেখে বলা যাবে যে, ৩ (অ) ছবির সমাধান সম্ভব হবে যদি গ কিংবা ঘ থেকে হাঁটা শুরু করা যায়। ৩ (আ) ছবির কিন্তু কোনও সমাধান নেই, কারণ এখানে বিজোড় নোডের সংখ্যা দুইয়ের থেকে বেশি। ৩ (ই) ছবির সবগুলোই জোড় নোড়, সুতরাং সমাধান সম্ভব। শুধু

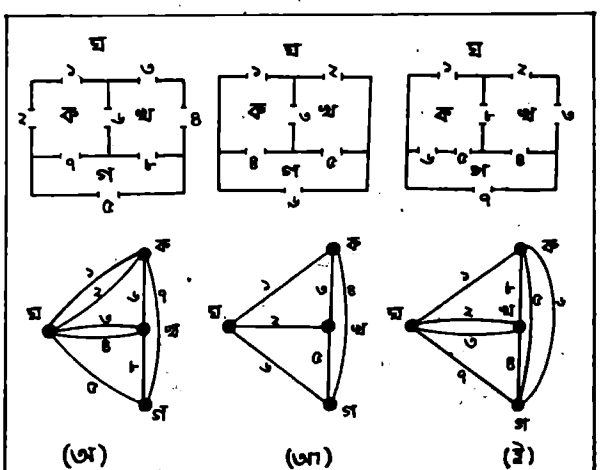

৩ নং ছবি

তাই নয়, যে-কোনও জায়গা থেকে হাঁটা শুরু করলেই চলবে।

টোপলজির আর একটি বিখ্যাত সমস্যা, যেটিকে বলা হয় চার রঙের সমস্যা—তার কথা বলে লেখাটা শেষ করব। ১৮৫২ সালে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্র ফ্র্যান্সিস গাথরি ইংল্যাণ্ডের ম্যাপ আঁকতে গিয়ে খেয়াল করলেন যে, মাত্র চারটে রঙ ব্যবহার করলেই যে-কোনও কাউন্টিকে সংযুক্ত কাউন্টিগুলো থেকে আলাদাভাবে দেখানো যায়। ফ্র্যান্সিস অনুমান করলেন যে, শুধু ইংল্যাণ্ড নয়, সব দেশের ক্ষেত্রেই এটা নিশ্চয় সম্ভব হবে। কিন্তু কীভাবে সেটা প্রমাণ করা যায়? ফ্র্যান্সিস তাঁর ভাই ফ্রেডারিককে ধরলেন। ফ্রেডারিক ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অগাস্টাস ডি মর্গানের ছাত্র। ডি মর্গান ফ্র্যান্সিসের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি, যদিও তিনি কিছুদূর এগিয়েছিলেন। যেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি কোনও দেশের ম্যাপে চারটে প্রদেশ থাকে, যেখানে প্রত্যেক প্রদেশই বাকি তিনটি প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত (৪ (অ) ছবি দ্রষ্টব্য), তাহলে মাত্র চারটে রঙ ব্যবহার করেই ম্যাপটা আঁকা যাবে। (এখানে 'যুক্ত'প্রদেশ বলতে ধরা হয়েছে—যে প্রদেশগুলো কিছুটা অঞ্চল জুড়ে যুক্ত, শুধু কয়েকটা বিন্দুর মাধ্যমে নয়।) ডি মর্গান আরও প্রমাণ করলেন যে, যদি কোনও দেশে মোট পাঁচটি প্রদেশ থাকে, তাহলে তাদের এমন কোনও পারস্পরিক অবস্থান সম্ভব নয়, যেখানে প্রত্যেক প্রদেশই বাকি চারটি প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেহেতু পাঁচটি পরস্পর সংযুক্ত প্রদেশের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং চারটি পরস্পর সংযুক্ত প্রদেশ আঁকা যায় মাত্র চারটে রঙ ব্যবহার করে, অতএব যে-কোনও ম্যাপই চারটে রঙ দিয়ে আঁকা যাবে। একদিক থেকে প্রমাণটা অকাট্য মনে হলেও এতে যথেষ্ট গলদ আছে। ৫ (আ) ছবিটি দেখলেই সেটা স্পষ্ট হবে। এই ছবিতে এমন কোনও চারটে প্রদেশ নেই যারা পরস্পর সংযুক্ত। তবুও এই ম্যাপটা আঁকতে চারটে রঙের প্রয়োজন হবে। ভিতরের প্রদেশের জন্য একটা, আর বাইরের প্রদেশগুলোর জন্য তিনটে। এর কমে হবে না, তোমরা নিজেরাই সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারো। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যদিও পাঁচটি পরস্পর-সংযুক্ত প্রদেশ থাকা অসম্ভব, কিন্তু তার থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলো আঁকতে মাত্র চারটে রঙ নিলেই চলবে।

চার রঙের সমস্যা গণিতজ্ঞদের সত্যিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আরও ছাব্বিশ বছর পরে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার ক্যালে গাথরির অনুমান ভুল কি ঠিক প্রমাণ করতে না পেরে ১৮৭৮ সালে লণ্ডন ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটিতে সমস্যাটা পেশ করেন। রাতারাতি সমস্যাটা বিখ্যাত হয়ে উঠল। কিন্তু বহু গবেষকের নানান প্রচেষ্টা বিফল করে চার রঙের সমস্যা কিন্তু অজেয় হয়ে রইল। পণ্ডিতদের সংশয় জাগল, হয়তো গাথরির অনুমানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেটা সত্য হলেও প্রমাণ করা অসম্ভব! যুক্তিশাস্ত্রে এই অবস্থার উদ্ভব সময়বিশেষে হয়— কার্ট গোয়েডল্ সেটা প্রমাণ করেছিলেন।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এ-রকম একটা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত মাতামাতি করার কারণ কী? না হয় লাগলই পাঁচটা কি সাতটা রঙ, বাড়তি ক'টা পয়সাই বা খরচা হবে তাতে? কথাটা খাঁটি। কিন্তু এমন একটা সাধারণ প্রশ্নের কোনও সমাধান থাকবে না, এটা পণ্ডিতদের পক্ষে মেনে নেওয়াটা ছিল কঠিন। তাঁদের প্রচেষ্টা একদিক থেকে বিফল হলেও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য দেখা গেল অসাধারণ। চার রঙের সমস্যার সমাধান হল না ঠিকই, কিন্তু তার ওপর গবেষণার ফলে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের শাখা গ্রাফ থিওরি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হল।

অবশেষে ১৯৭৬ সালে ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ের দুই অধ্যাপক কেনেথ অ্যাপেল ও উলফগ্যাঙ হেকেন কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটির সমাধান করেন। কিন্তু সমাধানটি বহু পণ্ডিতকেই সন্তুষ্ট করল না। অ্যাপেল ও হেকেনের প্রমাণের যথার্থতা বিচার করতেও কমপিউটারের দরকার পড়ে। অনেক পণ্ডিতই খুঁজছিলেন একটা প্রমাণ, যেটা হবে স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত। কে জানে তেমন প্রমাণ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না!

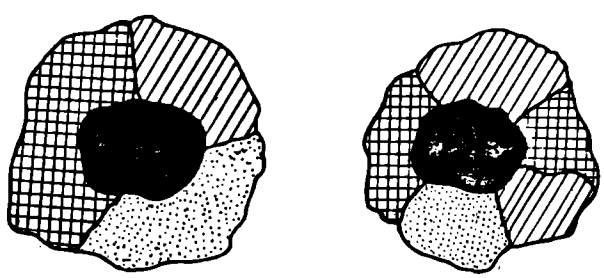

(অ) (আ)

৪ নং ছবি

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে সেই গ্রামে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। এখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেও কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে এসে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল। তারপর আর দিপুও ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে গেলেন এক সাধুবাবার কাছে। সেখানে হঠাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। সাধুবাবা ইরানিকে বললেন বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিপুর নাম ধরে ডাকতে। একবার প্রচণ্ড জোরে বাজপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইরানি অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর···

দিপু আবার ফিরে এসেছে আমবাগানে। তার খিদে পাচ্ছে একটু একটু। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, স্বপ্নের মধ্যে থাকলে খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না। তাহলে এখন কি সে স্বপ্নের মধ্যে আছে, না জেগে উঠেছে? জ্যাঠামশাইকে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ডমরুজিও কাছাকাছি নেই। ওঁরা গেলেন কোথায়?

এই আমবাগানটা কোন্ জায়গায় তা দিপু জানে না। বাগানটি বেশ বড়। অধিকাংশ জায়গাই ঝোপঝাড়ে ভরা, মাঝে-মাঝে একটু-একটু ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গায় বেশ সুন্দর নরম ঘাস, ঠিক সবুজ কার্পেটের মতন বিছানো। অবশ্য খানিকটা দূরেই দেখা যাচ্ছে মাঠে গোরু চরছে। দুটো রাখাল-ছেলেও রয়েছে। এক ছুটে ওখানে চলে যাওয়া যায় না? ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই নিশ্চয়ই জানা যাবে ঘোড়াডাঙা কত দূরে।

কিন্তু জ্যাঠামশাইকে না নিয়ে সে ফিরবে কী করে? তাহলে তো এতদূরে আসার কোনও মানেই হয় না। সেই একটা অচেনা জায়গায় একটা মোটর গ্যারাজের সামনে বাবাকে দেখতে পাওয়ার পর থেকেই দিপুর মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর এসেছেন বাবা। জ্যাঠামশাইয়ের বাগানে এসে পৌঁছলেও তো কিছুই খবর পাবেন না।

ডমরুজি গেলেন কোথায়? তাঁকে কী করে ডাকতে হয় দিপু জানে না। যখন-তখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে, তিনি বলেছেন, তিনি এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

ডমরুজির ব্যাপারটা যে ঠিক কী, তা দিপু এখনও বুঝতে পারছে না। উনি স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে পারছেন না। তবে কি উনি শূন্যে ঝুলছেন? মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার শরীরটা তো এক জায়গায় শুয়ে থাকে। শরীরটাও হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে নাকি?

দিপু উঠে বসে একটা গাছের গুঁড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেখানে কেমন যেন আলোছায়ার খেলা চলছে। কী যেন একটা ছবি সরে সরে যাচ্ছে।

দিপু অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী? এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল মুখ ঘুরিয়ে। না, কেউ তো সেখানে আলো ফেলছে না। হঠাৎ যেন জায়গাটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েই আবার আগের মতন আলো ঝলমলিয়ে উঠল। তারপর দিপু দেখল সেখানে দুটি বাচ্চা ছেলে খলখল করে হাসছে!

ছেলে দুটির বয়েস আট-ন' বছর, ছোট্ট ছোট্ট ধুতি পরা, আর খালি পা। ওদের দু'জনেরই একমাথা চুল আর মুখ বেশ সুন্দর। ছেলে দুটো একটা আখ খাচ্ছে। একটাই আখ, একবার একজন কামড় দিচ্ছে, আর-একবার অন্য একজন। দারুণ যেন একটা মজার ব্যাপার, এইভাবে মাঝে-মাঝে ওরা হেসে উঠছে খিলখিল করে।

দিপুকে ওরা দেখতেই পাচ্ছে না।

দিপু চোখ রগড়াল। এটাও কি স্বপ্ন নাকি? কিন্তু ছেলে দুটো তো একেবারে তার সামনেই। সে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে।

দিপু হাত বাড়াতেই ছেলে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর গাছের ওপর থেকে কে যেন ডেকে উঠল, "দিপু! দিপু!"

দিপুর সারা গায়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল। এসব কী হচ্ছে রে বাবা! ছেলে দুটো মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে? এই তো এইমাত্র জলজ্যান্ত ভাবে হাসছিল।

দিপু গাছের ওপর দিকে তাকাল। কে ডাকছে তাকে?

ওপরে কিছুই দেখতে পেল না সে। একটা কী পাখি যেন পিক-পিক করছে। অথচ দিপু স্পষ্ট নিজের নাম শুনতে পেয়েছে।

দিপু উঠে এবার সামনের মাঠটার দিকে যেতে চাইল। ওখানে রাখাল দু'জন এখনও রয়েছে। একজন রাখাল কী যেন একটা গান ধরেছে, তাও শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে।

আবার কেউ ডাকল, "দিপু! দিপু!"

দিপু এবার উত্তর দিল, "কে? কে?"

আবার সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল কয়েক পলকের জন্য। কেউ যেন একটা কালো পর্দা টেনে দিচ্ছে তার চোখের সামনের দিকে। দিপু দেখতে পেল বাতাস যেন ময়ূরের পালকের মতন চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তার গায়ে যে বাতাস এসে লাগছে, তা যেন একটা সূক্ষ্ম মাকড়সার জালে বোনা শাল।

সেই রঙিন বাতাস গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে মাঠের দিকে।

"ভয় পেয়ে গেলে নাকি, দিপুবাবু?"

চমকে পাশ ফিরে তাকাতেই দিপু দেখতে পেল

ডমরুজিকে। তিনি কখন আবার ফিরে এসেছেন।

দিপু তাঁর হাত চেপে ধরে বলল, "এই মাত্র কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম ? ঠিক করে বলুন তো !"

ডমরুজি হেসে বললেন, "না, স্বপ্ন দ্যাখোনি।"

"তা হলে এই মাত্র যে দুটি বাচ্চা ছেলেকে দেখলুম, তারা কোথায় গেল ?"

"তা তো জানি না !"

"আমার চোখের সামনে ওরা হাসছিল আর একটা আখ খাচ্ছিল, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে ? তবে কি ওরা..."

"তোমার ভূতের ভয় আছে নাকি ?"

"না ! ভূত আবার কী ? কিন্তু ওরা মিলিয়ে গেল বাতাসে।"

"তুমি বোধহয় অনেকদিন আগের কোনও দৃশ্য দেখেছ !"

"তার মানে ?"

"পৃথিবী থেকে সব কিছু হারিয়ে যায় না। অনেক সুন্দর দৃশ্য থেকে যায়। দুটি ছেলে একটা আখ খেতে খেতে হাসছে, এটা একটা সুন্দর দৃশ্য না ? এই সব দৃশ্য মাঝে-মাঝে ফিরে আসে। যারা ভাগ্যবান, শুধু তারাই দেখতে পায়।"

"এখানকার বাতাসও কী রকম রঙিন হয়ে গেছে।"

"যখন সুন্দর কিছু ঘটে, তখন হাওয়াও বদলে যায়। একে বলে সুপবন !"

দিপু আর কিছু বলার আগেই আবার কে যেন 'দিপু, দিপু' বলে ডেকে উঠল। গলার আওয়াজটা খুব চেনা।

"আমায় কে ডাকছে ! আমায় কে ডাকছে !"

"হ্যাঁ, তোমাকে একজন ডাকছে ঠিকই। সেইজন্যই তো আমি তাড়াতাড়ি তোমার দিকে ছুটে এলুম।"

"কে ডাকছে ?"

"শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে !"

"আপনি কী বলছেন ? কেন মন খারাপ হবে ?"

"ঠিক আছে, চলো, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।"

ডমরুজি কাছে এসে দিপুর চোখে হাত বোলাতেই দিপু ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার দেখতে পেল অনেক কিছু। স্বপ্নের মতন দেখা নয়, অবিকল বাস্তবের মতন।

দিপু দেখল নদীর ধারে একটা শ্মশানমতন জায়গা। সেখানে খুব বৃষ্টি পড়ছিল বোধহয় এই মাত্র, মাটি দিয়ে জল গড়াচ্ছে, বাতাসে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

কাছেই একটা কুঁড়েঘর। তার সামনের খোলা জায়গাটায় একটা মেয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে একজন গেরুয়া-পরা সাধু, আর অন্য দু'জন লোক। এর মধ্যে একটি লোক দিপুর চেনা। হাওড়া থেকে ট্রেনে আসবার সময় এই লোকটাই ডাকাতদের কাছ থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল।

সাধুবাবাটি অজ্ঞান মেয়েটিকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিতেই তার মুখ দেখতে পেয়ে দিপু আর্তস্বরে বলে উঠল, "দিদি !"

ডমরুজি বললেন, "হ্যাঁ, তোমার দিদি এতক্ষণ তোমায় ডাকছিল। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভয় নেই, ওর কোনও ক্ষতি হবে না।"

দিপু বলল, "দিদি আমায় ডাকছিল ? আমি তা শুনতে পেলাম কী করে ?"

"তোমার দিদির সাংঘাতিক মনের জোর। মনটাকে এমন একাগ্র করে তুলেছিল যে, ঠিক খুঁজে পেত তোমাকে। কিন্তু তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এ খুব সাংঘাতিক শক্ত ব্যাপার।"

"আমার দিদি এখানে এল কী করে ? ওই সাধুটি কে ?"

"ঐ সাধুটি হচ্ছেন আমার গুরুভাই। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি আবার ফেরার পথ খুঁজে পেতে পারতুম। কিন্তু কিছুতেই যে কথা বলতে পারছি না।"

"এই তো এত কাছে, কথা বলুন না।"

"আমরা তো স্বপ্নের জগতে রয়েছি না ? আমাদের কথা ওরা শুনতে পাবে না। আমি আমার স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে বাইরে শরীর ধরে আসার চেষ্টা করলেই যে সাংঘাতিক একটা উত্তাপ হয়। মেঘ গলে যায়। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি নামে।"

"এসব কী বলছেন আপনি ?"

"দাঁড়াও, এসব কথা পরে হবে। আমি হঠাৎ আর একটা জিনিস টের পাচ্ছি। তোমার দিদি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে আর স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যে সে তোমাকে খুঁজছে। আমার গুরুভাই ওই যে সাধুটি, উনি তোমার দিদিকে মায়ানিদ্রা দিয়েছেন। এসো, এখন আমরা তোমার দিদির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ি।"

"কী করে ঢুকব ?"

"তুমি চোখ বুজে শুধু তোমার দিদির কথা ভাবো। আর কিছু ভাববে না কিন্তু। দিদির মুখখানা ভাবো, আর তার নাম ধরে ডাকো। ঘুমোও, ঘুমোও, আর কেউ নেই, শুধু তোমার দিদি, শুধু ইরানি, শুধু ইরানি..."

দিপু আচ্ছন্নের মতন বলে উঠল "দিদি, আমি এখানে !"

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ফ্যাশন-ডিজাইনার আইভন লা-গলিয়েন কিন্তু অন্য চিন্তায় মগ্ন। তার নকশা ফার্স্ট হল কি না, সে-দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই তার।

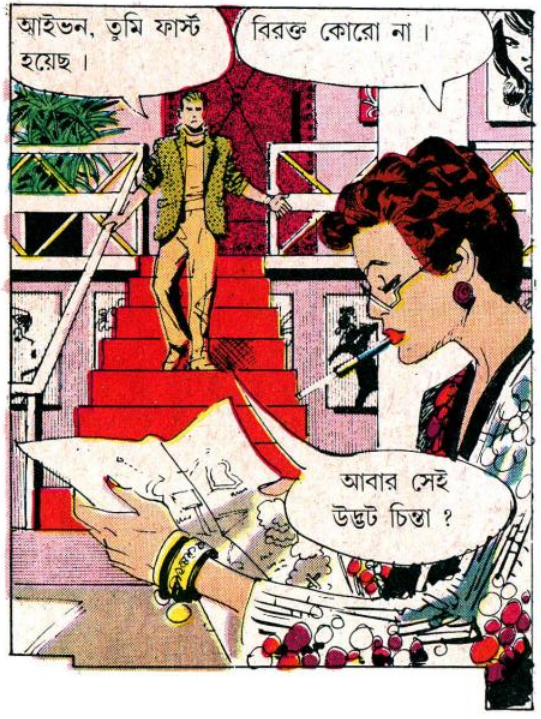

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

Amela—6 (3.4.85)

সম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমাংশ

ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

শৈবাল মিত্র

কুড়ি হাজার দুশো ফুট উঁচুতে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ আর আবহাওয়া দেখে সকলের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঘন সাদা মেঘের চাদরে ঋষিপাহাড়ের শিখরটা ঢাকা। মেঘ নয়, যেন কোনো সন্ন্যাসীর আলুথালু বিরাট এক জটা, জটাধারী ঋষ্যশৃঙ্গ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আকাশের গায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুধু ঋষিপাহাড়ের মাথায় নয়, চারপাশের অন্যান্য শিখর, সাফমিনাল, দুনাগিরি, চ্যাংব্যাং, দেবীমুকুট, হনুমান, কলঙ্কের শিখরেও মেঘ জমে আছে। আরও উত্তরে, ঋষিপাহাড়ের শৃঙ্গের আড়ালে হরদেওল আর ত্রিশূলের চূড়া। সেদিকেও জমাট মেঘ। ডান হাতে নন্দাদেবী মেঘ আর অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। হিমশীতল বাতাস বইছে হু হু করে। বাতাস যেন বরফের ধারালো ছুরি ; সে বাতাসের কামড়ে সকলের হাড়ের ভেতরে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেছে।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই শিখরাভিযানের জন্যে ওরা তৈরি হয়েছে। পাঁচজনের শরীরেই পর্বতারোহীর পোশাক—ফেদার জ্যাকেট, উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার্স, বুট, গেটার, বুটকভার, চোখে তুষার চশমা, স্নো গগলস্, দু'হাতে উলের হাতমোজা, হাতমোজার ওপর নাইলনের ঢাকা, তবু শীত আটকাচ্ছে না। আর মাত্র তিন হাজার ফুট উঠলেই ঋষিপাহাড়ের শিখর ছোঁয়া যাবে। আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অভিযাত্রীদল সে শিখরে পৌঁছোতে পারেনি। শুধুমাত্র একদল জাপানি পর্বতাভিযাত্রী উনিশশো পঁচাত্তর সালের আটাশে সেপ্টেম্বর ঋষিপাহাড়ের মাথায় পৌঁছেছিল। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। ঋষিপাহাড়ের বরফ-ঢাকা ওই দুর্গম শিখরে তার পর আর কোনও মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি।

গতকাল শেষবিকেলে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে দলনেতা প্রদীপ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ইন্দ্রনাথ আর অমূল্যকে আলাদা করে ডেকে বলেছিল, "এতটা এসে পিকে (চূড়া) না উঠে ফিরে যাব ? এটা হয় না।"

প্রদীপ এই দলের শুধু নেতা বা লিডার নয়, দলের প্রধান

উদ্যোক্তা, প্রাণপুরুষ। পাহাড় প্রদীপের জীবন। কথায় আলোচনায়, চিন্তায় এমনকী ঘুমের সময়ে স্বপ্নের মধ্যেও পাহাড় এসে হাজির হয়। প্রদীপ প্রকৃত পর্বতপ্রেমিক।

প্রদীপের মনের গোপন আশঙ্কার কথা ইন্দ্রনাথ আর অমূল্য আগেই টের পেয়েছিল। চার নম্বর ক্যাম্পে বসে এবং চার নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে আসার পথে প্রদীপই এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু কথা বলেছিল। মনে মনে ইন্দ্রনাথ আর অমূল্যও ঋষিপাহাড়ের শিখরে ওঠার কথা ভাবছিল। প্রদীপের প্রস্তাবে তাই তারা দুজন লাফিয়ে উঠল। অমূল্য বলেছিল, "জাতীয় পতাকা আর আমাদের ঝাণ্ডা সামিটে (চূড়া) না পুঁতে নামব না।"

চার নম্বর ক্যাম্প থেকে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে প্রদীপ, ইন্দ্রনাথ এবং অমূল্য ছাড়া আরও দুজন উঠেছিল। বাবুলাল এবং মুনমুন। ওদের দুজনকে শিখরজয়ের পরিকল্পনাটা প্রদীপ প্রথমে বলেনি। বাবুলালের পাহাড়ে চড়ার অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট নেই। মুনমুনের সে সার্টিফিকেট থাকলেও সে মেয়ে, সে হয়তো এই অপরিকল্পিত অভিযানের ঝুঁকি নেবে না। ঠিক ঋষিপাহাড়ে ওঠার কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। সরকারি অনুমতিতে বলা ছিল, নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি পরিক্রমার সঙ্গে একটি শিখরে চড়া যাবে। কোনও বিশেষ শিখরের নাম সরকারি হুকুমে উল্লেখ করা ছিল না। পরিক্রমার ইংরিজি প্রতিশব্দ হল ট্র্যাভার্স। কাঞ্চনজঙ্ঘা ফাউণ্ডেশনের এই অভিযানের নামও তাই দেওয়া হয়েছিল, নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি ট্র্যাভার্স, ১৯৮২।

গতকাল রাতে শিখরজয়ে বেরোবার জন্যে মালপত্র গোছগাছ করার আগে প্রদীপ যখন তার পরিকল্পনার কথাটা শোনাল, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। বাবুলাল প্রশ্ন করল, "বিনা অনুমতিতে ঋষিপাহাড়ে চড়াটা কি ঠিক হবে?"

"অসুবিধে কী," একটু অসন্তুষ্ট হয়েই প্রদীপ বলেছিল, "ট্র্যাভার্স করার কথা বলে সরকারি অনুদান হিসেবে আমরা যে পরিমাণ টাকা পেয়েছি, সামিট ক্লাইম্ব করার কথা বললে তার

LINTAS.LR.42-2739 BG

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

লিরিল অনন্য নতুন রূপে !
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে।

নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে ঢলঢল নারীতে!

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

অর্ধেক পেতাম। আমাদের মতো একটা গরিব সংগঠনের পক্ষে তাহলে এই অভিযান করা সম্ভব হত না। এই বিশ হাজার ফুটে এক কেজি মাল আনতে চল্লিশ টাকা খরচ পড়েছে।"

প্রদীপের কথায় বাবুলাল কোনও সাড়া করল না। প্রদীপ আবার বলল, "তাছাড়া আমরা কোনও অপরাধ করছি না। একই সঙ্গে ট্র্যাভার্স আর ক্লাইম্ব করছি। যে-কোনও একটা শিখরে ওঠার হুকুম আমরা পেয়েছি।"

মালপত্র গুছিয়ে অন্ধকার ক্যাম্পের ভেতরে পাঁচটা স্লিপিং ব্যাগে ওরা পাশাপাশি শুয়েছিল। রাত প্রায় এগারোটা। ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ হিমালয়। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বাইরের আবহাওয়া ভাল। এক-আকাশ তারা উঠেছিল। একটু আগে বরফ গলিয়ে ওরা খিচুড়ি রেঁধে খেয়েছে। খাওয়ার পর যে যার প্লেট জিব দিয়ে চেটে সাফ করছে। জলের অভাবের দরুন সেই তিন নম্বর ক্যাম্প্ থেকেই এই প্রথা চলছে। ক্যাম্পের ভেতরের অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। প্রদীপ একটা বিড়ি ধরাতে ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল। এক লহমার আলো, পরক্ষণেই অন্ধকার। ইন্দ্রনাথের দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে প্রদীপ বলল, "নে।"

ইন্দ্রনাথ বিড়িটা নিল। প্রদীপের ওপর বিরক্তিতে বাবুলালের মনটা তেতো হয়ে গেল। একটু আগেই প্রদীপের কাছ থেকে বাবুলাল একটা বিড়ি চাইতে প্রদীপ বলেছিল, "বিড়ি নেই।"

অন্ধকারে একটা হাত বুকের ওপর এসে পড়তে বাবুলাল দেখল, ইন্দ্রনাথের হাত। ইন্দ্রনাথের দু' আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি। ইন্দ্রনাথ বলল, "বিড়িটা ধর।"

"দরকার নেই," বাবুলাল জানাল।

ইন্দ্রনাথ বলল, "দরকার নেই বললে তো হবে না। আমি কি বিড়ি খাই! এটা তোর জন্যেই।"

বাবুলাল বিড়িটা নিয়ে টানতে লাগল।

অন্ধকারে খুকখুক হাসির শব্দ শুনে বাবুলাল বুঝল, প্রদীপ হাসছে।

বাবুলালের মনের তেতো ভাবটা কেটে গেল। আঠারো হাজার ফুট থেকেই বাবুলালের মেজাজটা খিচড়ে আছে। নানা সময়ে প্রদীপের সঙ্গে খিটিমিটি ঝগড়া লেগেছে। এমনিতে পাহাড়ের ওপর, উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যুক্তি বুদ্ধি বেতাল হয়ে যায়, অস্বাভাবিক আচরণ করে। অক্সিজেনের অভাবে এটা হয়। কিন্তু বাবুলালের মেজাজ খারাপের কারণ এই একটা নয়। দলনেতা প্রদীপের আচরণে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। পাহাড়ে ওঠার কিছু নিয়ম প্রদীপ যেন ইচ্ছে করেই ভেঙে ফেলতে চাইছিল। বাবুলালের এটা পছন্দ হয়নি। এই অপছন্দের কথা বাবুলাল কয়েকবার সরাসরি প্রদীপকে বলেছে। প্রদীপ শুনেছে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি। ফলে মনকষাকষি বেড়েছে। বাবুলাল এসব স্মৃতি অনায়াসে ভুলে যেত, যদি ঋষিপাহাড়ের শিখরে চড়ার জন্যে দলনেতা তার নাম বলত। কিন্তু নেতা কিছুই বলল না। অন্ধকারে হঠাৎ বিড়িটা পেয়ে বাবুলালের মনে হল, দলনেতা প্রদীপ সামিটে ওঠার আগে সন্ধি চাইছে। খুব ভাল, এক মুহূর্তে বাবুলাল পুরনো কথা ভুলে গেল। কিন্তু ঠিক করল, সামিটে সে যাবেই, কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

॥ দুই ॥

ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে, ফর্দ মিলিয়ে মালপত্র ভাগ করে নিল। সামিটে ওঠার জন্যে পাঁচজন তৈরি। ঠিক হয়েছে, পাঁচজনই ঋষিপাহাড়ের শিখর ক্লাইম্ব করবে। বাইরে তখনো বেশ অন্ধকার। শাঁইশাঁই হাওয়ার শব্দ ওরা শুনতে পেল। ক্যাম্পের পর্দাটা অল্প সরিয়ে ইন্দ্র দেখল, আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার। একঝলক তুষারঝড়ে ইন্দ্রের শরীর কুঁকড়ে গেল। বাকি চারজন এবার বাইরের দিকে তাকাল।

সকলের মুখই গম্ভীর, চিন্তাচ্ছন্ন। এ-রকম দুর্যোগ মাথায় করে তিন হাজার ফুট খাড়াই বরফ ভেঙে শিখরে ওঠা অসম্ভব। অপেক্ষা করতে হবে। হিমালয়ের এই উচ্চতায় প্রকৃতি খুব খামখেয়ালি। আবহাওয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে যায়। মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, তুষারঝড় ভাইবোনের মতো গলা-জড়াজড়ি করে আসে। এখনই হয়তো মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠবে। চোখের সামনে জেগে উঠবে সাদা বরফে ঢাকা নন্দাদেবী, ত্রিশূল, সাফমিনাল আর ঋষিপাহাড়ের চূড়া। চারপাশ থেকে হাতছানি দেবে নন্দাঘুন্টি, রন্টি, বেতারথলি আর বহুগুণার উঁচুনিচু শিখরগুলো। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রদীপ বলল, "মাভৈ, তিন হাজার ফুট কোনো ব্যাপার নয়। যাব আর আসব। জাপানিরা ছ'ঘণ্টায় সামিট ক্লাইম্ব করে ফিরে এসেছিল। বেরোতে একটু দেরি হলেও রাত আটটার মধ্যে ফিরে আসব। আজ পূর্ণিমা, সন্ধের পরেই চাঁদ উঠবে। আলোর অভাব হবে না। তারপর রাতটা এই পাঁচ নম্বরে কাটিয়ে কাল ভোরে উঠে নীচের ক্যাম্পের দিকে রওনা হব। চার নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছতে একদিন দেরি হবে। শান্তনু আর সোমেন হয়তো সেখানে আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করবে, কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তাদের একটু কষ্ট দেব। উপায় নেই। হাই অলটিচুডে এ-রকম একটু দেরি হতেই পারে।"

দলের আর চারজন মন দিয়ে প্রদীপের কথা শুনছিল। যাত্রা শুরু করার জন্যে ওরা বেশ উত্তেজিত, ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্ধকার সামান্য পাতলা হয়েছে। প্রদীপ বলল, "একদিন দেরি হলেও আমাদের মূল কর্মসূচী বদলাবে না। তেসরা অক্টোবরই আমরা বেসক্যাম্পে পৌঁছে যাব। তারপর লতাগ্রাম।"

চোখের সামনে ক্যামেরা ধরে ইন্দ্রনাথ ক্যাম্পের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আর অন্ধকারের জন্যে এখনও একটাও ছবি ও তুলতে পারেনি। কাল বিকেলে অবশ্য পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছেই ত্রিশূল, নন্দাদেবী, সাফমিনাল এবং ঋষিপাহাড়ের অনেকগুলো ছবি বিভিন্ন কোণ থেকে ও তুলেছিল।

প্রদীপ হঠাৎ বলল, "ঋষিপাহাড় জয়ের খবর কলকাতায় পৌঁছোলে দেশজুড়ে দারুণ হৈচৈ হবে। এ-রকম সাদামাটা উপকরণ নিয়ে ঋষিপাহাড়ের মাথায় ওঠার কথা বিদেশীরা ভাবতেই পারে না।"

কথা শেষ করে দু'চোখে কেমন এক প্রগাঢ় স্বপ্নমাখা দৃষ্টি নিয়ে ঋষিপাহাড়ের শিখরের দিকে প্রদীপ তাকিয়ে থাকে।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। অমূল্য ঘন-ঘন হাতের ঘড়ি দেখছে। ছ'টা বেজে গেল, অথচ আকাশে আলো ফুটছে না। বেরোতে দু'ঘণ্টা দেরি হওয়ায় অমূল্য বেশ ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছে। নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি পরিক্রমার এই অভিযানে শুরু থেকে অমূল্যই রুট ফাইণ্ডার, পথপ্রদর্শক। দড়ির সামনেটা কোমরে বেঁধে অজানা, দুর্গম পাহাড়ে পথ খোঁজার জন্যে সকলের আগে অমূল্য উঠেছে। মাঝখানে থেকেছে প্রদীপ, তারপর বাকিরা। অমূল্য পথের সংকেত পাঠাবার পর অন্যেরা এগিয়েছে। আজও অমূল্য পথনির্দেশক, সকলের আগে থাকবে, পথ দেখাবে। তাই সে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। মেঘে ঢাকা ঋষিপাহাড়ের আবছা চূড়ার দিকে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে প্রদীপ তখনো তাকিয়ে আছে। বেরিয়ে পড়ার জন্যে অমূল্যর তাগাদা প্রদীপের কানে ঢুকল না।

"একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম," প্রদীপ বলল ইন্দ্রকে।

"কী," জানতে চাইল ইন্দ্র।

"দেখলাম, সামিটের ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি।" প্রদীপের কথা শুনে সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। প্রদীপও হাসল। তারপর বলল, "এই শেষ, আর পাহাড়ে চড়ব না।"

প্রদীপের মুখে এমন একটা কথা শুনে সকলে তাকাল তার দিকে। বাবুলাল প্রশ্ন করল, "পাহাড়ের ওপর হঠাৎ এত বিরাগ কেন ?"

প্রদীপ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "পাহাড়ের নেশা বড় সাংঘাতিক। আমি জানি, এই নেশার জন্যে আমি একদম অন্যরকম হয়ে গেছি। বাড়িতে বুড়ো বাবা, অসুস্থ মা, ছোট ভাইবোন, গোটা সংসার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের জন্যে আমি কিছুই করি না। কলকাতায় ফিরে ব্যবসাটা নিয়ে লাগতে হবে।"

প্রদীপের কথা শুনে মুনমুন আর অমূল্য হাসল। প্রদীপের মুখ থেকে এ-কথা আগেও ওরা অনেকবার শুনেছে।

॥ তিন ॥

বেলা আটটার পর হাওয়ার তেজ একটু কমল। ঋষিশৃঙ্গের মাথার মেঘের জটা অল্প পাতলা হলেও চাপ-চাপ মেঘ একেবারে সরে গেল না। প্রায় মিনিট-পনেরো বেশ ভালরকম তুষারপাত হওয়ার পর আকাশের গায়ে ফিকে রোদ দেখা গেল। আর দেরি নয়, এখনই যাত্রা করা উচিত। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে পাঁচজন বেরিয়ে পড়ল। সকলের আগে অমূল্য, তার হাতে আইস অ্যাক্স—বরফ কাটার গাঁইতি। কফির ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাবুলাল ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়াল। চারপাশে জমাটবাঁধা সাদা বরফ। যতদূর চোখ যায়, বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড়ের শিরায়, খাঁজে-খাঁজে ঢেউ-খেলানো শক্ত কঠিন বরফ দেখে মনে হয়, সাদা রঙের একটা নিশ্চল, শব্দহীন মহাসমুদ্র। ক্যাম্পের সামনে ইন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুলালও ক্যামেরায় ছবি তুলছিল। ইন্দ্রই বলল বাবুলালকে ক্যামেরা চালাতে। কেননা নিজের ক্যামেরার ছবিগুলো এই বাজে আবহাওয়ায় কেমন উঠবে ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিল না। তাই বাবুলালকে ডাকা। বাবুলালও ভাল ফোটোগ্রাফার। ছবি তোলা শেষ করে ডান হাতের উলের হাতমোজার ওপর নাইলনের ঢাকাটা লাগাবার সময় বাবুলালের হাত থেকে সেটা পাশেই পড়ে গেল। হু-হু হাওয়ায় ঢাকাটা উড়ে যাওয়ার আগে সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরার জন্যে বাবুলাল পা বাড়াতেই একটা আছাড় খেল। ক্যাম্পের সামনে এভাবে পা পিছলে পড়ে গিয়ে বাবুলালের মনটা ভারী খিঁচড়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে বাবুলাল দেখল নাইলনের ঢাকাটা টুপটুপ করে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!

তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপূর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!

নতুন

পণ্ডস্

ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান

যাচ্ছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প ছেড়ে দুশো ফুট ওঠার পর শক্ত বরফের দেওয়াল দেখে প্রদীপ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দড়িতে টান পড়ায় অমূল্যকেও দাঁড়াতে হল। কাঁধের ফ্লাস্কটা দেখিয়ে প্রদীপ বলল, "এটা বইতে পারছি না। ভীষণ ভারী।"

ফ্লাস্কটা বাবুলালের। কফি ভরে এটা সে নিজেই বইছিল। নাইলনের ঢাকনাটা ধরতে গিয়ে আছাড় খাওয়ার পর প্রদীপ ফ্লাস্কটা চেয়ে নিয়েছিল। ইন্দ্র বলল, "আমাকে দাও।"

বাবুলাল বলল, "ভেতরের গরম কফিটা খেয়ে ফ্লাস্কটা ফেলে দাও। কে বইবে?"

পাহাড়ের ওপর হালকা-পলকা জিনিসও খুব ভারী হয়ে ওঠে। তাই যতটা সম্ভব কম জিনিস নিয়ে, নির্ভার হয়ে পাহাড়ে চড়তে হয়।

ফ্লাস্কের কফি পাঁচজন ভাগ করে খাওয়ার পর বাবুলাল ফ্লাস্কটা ফেলে দিল। বরফ কেটে আরও একশো ফুট ওঠার পর ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল মুনমুনকে, "তোর কী হয়েছে?"

হাতের আইস অ্যাক্সটা মুনমুন ঠিকমতো ধরতে পারছিল না। ইন্দ্রনাথের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না সে।

"তোর কি ওপরে উঠতে ভাল লাগছে না," ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করল মুনমুনকে।

মুনমুনকে সত্যি একটু কাহিল দেখাচ্ছিল। ইন্দ্র এবার দুটো ধাপ নেমে মুনমুনের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর দস্তানার ভেতর থেকে মুনমুনের ডান হাতটা বার করে হাতের চেহারা দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। মুনমুনের ডান হাতের আঙুলগুলো অসাড়, শক্ত। হাতের চামড়ার রঙও কেমন নীলচে।

"কী করে হল," ইন্দ্র জানতে চাইল।

"ক্র্যাম্পঅন বাঁধার সময় হাতটা বরফে লেগে গিয়েছিল," মুনমুন বলল।

ক্র্যাম্পঅন হল একধরনের কাঁটা, পাহাড়ে ওঠার সময় জুতোর তলায় লাগাতে হয়।

মুনমুন আবার দস্তানা পরে নিয়েছে।

"জ্বালা করছে?" ইন্দ্র প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

সেই স্তব্ধ, সাদা, বিশাল বরফের সমুদ্রে কোথাও কোনও শব্দ নেই। ইন্দ্রনাথ আর মুনমুনের কথা তাই সকলেই শুনতে পাচ্ছিল।

এক লহমা কী একটা ভেবে নিয়ে ইন্দ্রনাথ মুনমুনকে প্রশ্ন করল, "ফিরে যাবি?"

মুনমুন নিরুত্তর, কথা বলল না। কিন্তু তার নীরবতাই বুঝিয়ে দিল যে, সে ফিরে যেতে চায়।

ইন্দ্রনাথ বলল, "পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে তুই অপেক্ষা কর। আমরা সন্ধের আগেই ফিরে আসব।"

প্রায় পঁচিশ ফুট ওপরে দড়ি ধরে প্রদীপ দাঁড়িয়ে ছিল। ইন্দ্রনাথের কথা শেষ হতেই প্রদীপ প্রশ্ন করল, "মুনমুনের সঙ্গে কে থাকবে?"

অমূল্য অনেকটা ওপরে। প্রদীপের প্রশ্ন শুনে সে ফিরেও তাকাল না। শুধু ইন্দ্রনাথ আর বাবুলাল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। এই অভিযান শুরুর সময়েই দলের সদস্যরা মিলে কয়েকটা নিয়ম তৈরি করেছিল। তার একটা হল, অভিযানের মাঝপথে কোনো অসুস্থ সদস্যকে একা ছাড়া হবে না।

প্রশ্ন তুলে প্রদীপ সে-কথা মনে করিয়ে দিতেই ইন্দ্রনাথ আর বাবুলাল পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল। দুজনেই বুঝতে পারছিল যে, তাদের একজনকে মুনমুনের সঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু কে থাকবে? কয়েক সেকেণ্ড পরে বাবুলাল বলল, "মুনমুনের সঙ্গে আমি নেমে যাচ্ছি।"

একটু পরেই মুনমুন আর বাবুলাল পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের দিকে নামতে শুরু করল। বাবুলালের মুখ থমথমে, গম্ভীর। ঘাড় তুলে দেখল সাদা বরফের ওপর দিয়ে তিনটে মানুষ ধীর চালে ঋষ্যশৃঙ্গের শিখর লক্ষ করে উঠে যাচ্ছে। মুনমুনের অসুস্থ মুখটাও বাবুলালের নজর এড়াল না। মুনমুনের মুখে সঙ্কোচ আর লজ্জারও ছাপ। বাবুলাল বলল, "চিয়ার আপ মুনমুন!"

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে ফিরে সকালের

আছাড় খাওয়ার ঘটনাটা বাবুলালের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। দু'চোখ বুজে ও দেখতে পেল, নাইলনের সেই ঢাকাটা টুপটুপ করে অতল খাদের অন্ধকারের দিকে নেমে যাচ্ছে।

॥ চার ॥

পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে কয়েকশো ফুট ওঠার পরই তিনজন বুঝতে পারল যে, ওঠার গতি আশাপ্রদ নয়। খুব ধীর, ঢিলে চালে উঠছে। সামনে একটা লম্বা ফাটল। ঘুরে পেরোতে হল সেটা। আকাশ অন্ধকার। এখানে আকাশ মেঘাবৃত হলেই হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে। কষ্টদায়ক, উদ্দাম, তীব্র বাতাস। সূর্যের আলো আর হাওয়ার মধ্যে এ যেন লুকোচুরি খেলা। একটা এলে আর একটা লুকিয়ে পড়ে। ফ্যাকাসে মেঘের ঝাঁক চারপাশ থেকে ঋষিপাহাড়ের শিখরটাকে জড়িয়ে ধরছে। উঁচু-নিচু অসংখ্য শিখরের শরীর থেকে ধোঁয়ার মতো কুলকুল করে মেঘ বেরিয়ে আসছে। আরও বিশ-পঁচিশ ফুট উঠতেই বরফ পড়া শুরু হল। প্রথমে ঝিরঝির করে, তারপর প্রবল বেগে। একটা বিরাট পাউডারের কৌটোর মুখের ফুটোগুলো খুলে দিয়ে কে যেন উলটে দিয়েছে। সবকটা ফুটো দিয়েই অবিরল পাউডার বেরোচ্ছে। এ রকম মুষলধারে তুষারপাত সচরাচর দেখা যায় না। এ অবস্থায় ওঠা অসম্ভব। তিনজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠতে উঠতেই তিনজন বুঝতে পারছিল যে, পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে শিখর যত কাছে মনে হয়েছিল, আসলে তা নয়। ওদের ওঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চূড়াটা যেন সরে যাচ্ছে। হাতছানি দিচ্ছে আর সরে যাচ্ছে। তাছাড়া পথে এত ঢল, এত ফাটল আর চোরা দেওয়াল যে সময় চুরি হয়ে যাচ্ছে। সামনে অমূল্য, মাঝখানে প্রদীপ, তারপর ইন্দ্রনাথ। আবহাওয়ার অবস্থা দেখে অমূল্য আর ইন্দ্রনাথ সকাল থেকেই বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। এখন মাঝপথে এই বরফবৃষ্টিতে দুজনেই যেন একটু দমে গেল। কিন্তু ওরা কেউই হতাশ হওয়ার ছেলে নয়। ঋষিপাহাড়ের শিখর না ছুঁয়ে ফিরে যাবে না। তুষারপাতে ওরা দুজন কিছুটা বিমর্ষ হলেও, প্রদীপের মুখ দেখে মনে হল সে বেশ খুশি। সে যেন এটাই চাইছিল। এই অভিযানের শুরু থেকেই ইন্দ্রনাথের মনে হচ্ছিল, প্রদীপ হার্ড আইস বা শক্ত বরফকে ভয় পাচ্ছে। কঠিন বরফের পথ বা দেওয়াল দেখলেই ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে প্রদীপের মুখ। সাড়ে-চোদ্দ হাজার ফুটে প্রদীপ একবার পিছলে গিয়েছিল। তবে সেখানে বরফ ছিল না, খাড়া পাথরের দেওয়ালের ওপর দিয়ে এগোতে হচ্ছিল। সঙ্কীর্ণ, একফালি দেওয়াল। পড়লে অতলান্ত খাদ। পাঁচিলের চারপাশে পাথর ছড়ানো। রাশি-রাশি টুকরো পাথর ওপর থেকে ক্রমাগত খসে পড়ছিল। এটাকে বলে 'রক ফল্ এরিয়া'। পোর্টার মানসিং বলছিল, গত দুবছর পরপর দুজন অভিযাত্রী, একজন জার্মান অন্যজন সুইডিশ, এই 'রকফল্' এলাকায় পা পিছলে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

নির্বিকার, শান্ত মুখে আরো নানা বিপদের কাহিনী মানসিং শুনিয়েছিল। ইন্দ্রনাথ আর প্রদীপ দুজনেই শুনছিল মানসিং-এর কাহিনী। ইন্দ্রনাথের বেশ ভালই লাগছিল। পদে পদে এই বিপদ আর অনিশ্চয়তাই হিমালয়ের সৌন্দর্য। এই রহস্যময় সৌন্দর্যের হাতছানিতেই তো এত দূর আসা! হেলিকপ্টারে উঠে এভারেস্টের চূড়োয় নেমে আবার সেই হেলিকপ্টারেই ফিরে আসা যায়। কিন্তু তার নাম অভিযান নয়, সে হল আলালের ঘরের দুলালের এভারেস্ট ভ্রমণ। সে ভ্রমণে কোনো উত্তেজনা বা আনন্দ নেই।

হঠাৎ চোখের সামনে প্রদীপের পা পিছলে গেল। মানসিং ছিল ওদের মাঝখানে। সে যেন লক্ষ রাখছিল প্রদীপের ওপর। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছিল প্রদীপকে। মানসিং না ধরলে প্রদীপকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে চার নম্বরে যাওয়ার পথেই হার্ড আইস সম্পর্কে প্রদীপের ভয় এবং দুর্বলতার লক্ষণগুলো ইন্দ্রনাথ টের পেয়েছিল।

প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্যে তিন নম্বর ক্যাম্পে ওরা আটকে ছিল কয়েকদিন। তুষারপাত থামলে এক সকালে প্রদীপ আর অমূল্য পথ খুঁজতে বেরোল। সামনে শক্ত, খাড়া বরফের পাঁচিল। অমূল্য উঠছিল আগে। প্রদীপ পেছনে। কিছুটা উঠে অমূল্য দড়ি চাইছিল। দড়ি পেলে আরও সামান্য উঠে বরফের পাঁচিলের ওপাশে একটা রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাবে। বেশ কয়েকবার চেয়েও অমূল্য দড়ি পেল না। প্রদীপ দড়ি ছাড়ল না। বাবুলাল ছিল নীচে। ও প্রদীপকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছিল। পরে প্রদীপ বলেছিল, তার জুতোর ক্র্যাম্পঅন খুলে গিয়েছিল।

প্রবল তুষারপাতের সঙ্গে শনশন ধারালো হাওয়া বইছে। ঋষিপাহাড়ের শিখর আর দু' হাজার ফুটের বেশি নয়। এই দুর্যোগের মধ্যেই প্রদীপ এগোতে চাইছে। প্রায় ছ'ইঞ্চির মতো বরফ পড়েছে। শক্ত পুরনো বরফের স্তরের ওপর ঘন, মিহি বরফের নতুন স্তর। দুটো স্তরের রঙ আলাদা, ওপরেরটা সাদা, নীচেরটা রুপালি। বরফের রঙ যে কত রকম হতে পারে, হিমালয়ের এই উচ্চতায় এলে সেটা জানা যায়। ফিকে সবুজ তামার মতো জমাট বরফও ইন্দ্রনাথ দেখেছে। বরফের রঙ দেখে পাহাড়ের উচ্চতাও ধরা যায়। নরম, গলা বরফ দেখে প্রদীপের সাহস ফিরে এসেছে। এই দুর্যোগের মধ্যে বরফ কেটে ওঠা খুব মুশকিল। তবু দলনেতার নির্দেশ। অমূল্য ধীর পায়ে উঠতে থাকল। আরো পঞ্চাশ ফুট উঠে ওরা তিনজনেই অবাক। খটখটে রোদ। কোথাও সামান্য মেঘ বা এককণা বরফ নেই! পাঁচ নম্বর ক্যাম্প ছাড়ার পর থেকে ওরা বুঝতে পারছে, এক রহস্যময় অদ্ভুত জগতের দিকে ওরা এগিয়ে চলেছে। কুড়ি হাজার ফুট পর্যন্ত হিমালয়ের যে চেহারা আর চরিত্র ওরা দেখেছে, তার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের কোনও মিল নেই। প্রতি পঞ্চাশ-ষাট ফুটের ব্যবধানে সবকিছু বদলে যাচ্ছে। মেঘ, রোদ, তুষারঝড়, সামনে কোথায় যে কী আছে, বলা অসম্ভব। কোনওটাই আবার বেশি সময় থাকছে না। পনেরো-বিশ মিনিট অন্তর একটার পেছনে আর-একটা চলে আসছে।

ইন্দ্র একের পর এক ছবি তুলছে। হঠাৎ সূর্যের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রের মনে হল, দিন শেষ হতে আর দেরি নেই। ঠিক তখনই ওপর থেকে অমূল্য বলল, "সামনে আর-একটা বরফের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। ওটা না পেরোলে সামিটে যাওয়া যাবে না।"

খবরটা শুনে প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথ দুজনেই বেশ অবাক বিহ্বল হয়ে পড়ল। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে সাতশো ফুট ওঠার পরেও এই বরফের পাঁচিলটা ওরা দেখতে পায়নি।

দেখা সম্ভবও নয়। ঋষিপাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিক বেয়ে ওরা উঠছে। বরফের পাঁচিলটা রয়েছে ঢালেরই ওপর। কাছাকাছি না এলে চোখে পড়ার উপায় নেই। আসলে এটাও একটা চোরা দেওয়াল, হিমালয়ের মানচিত্রে নেই। এতক্ষণ ঢল বেয়ে ওরা এগোচ্ছিল। খাড়া বরফের পাহাড়, সরে যাওয়ার উপায় নেই। সোজা উঠতে হবে। পায়ের নীচে অতলান্ত খাদ। ডান পায়ের জুতোর তলার গজদাঁতের মতো কাঁটা বরফে গেঁথে, শরীরের ওজন সামনে রেখে ওরা এগোচ্ছে। বাঁ পায়ের জুতোর কাঁটা সামান্যই কাজে লাগছে। বরফের পাঁচিলটার সামনে ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল। পেছনে চ্যাংব্যাং ত্রিশূল আর কলঙ্কের শিখর আলো-অন্ধকারে ঝিলমিল করছে। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

"কী করা যায়?" অমূল্য প্রথম প্রশ্ন করল।

"দেড়-দু'ঘন্টার মধ্যে কি পৌঁছোতে পারব?" প্রদীপ পাল্টা প্রশ্ন করল।

"সম্ভব নয়," অমূল্য জানাল, "বরফের এই পাঁচিলটা না থাকলে হয়তো পৌঁছে যেতাম। কিন্তু এখন এই খাড়া পাঁচিলটা টপকাতেই দেড়-দু'ঘন্টা লেগে যাবে।"

"তাহলে কি ফিরে যাব?" প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ।

"অসম্ভব," প্রদীপ বলল।

প্রদীপের কথায় সকলে সায় দিল।

॥ পাঁচ ॥

একটা বরফের গুহার মধ্যে তিনজন বসে ছিল। সামনে একটা ছোট্ট স্টোভে কেরোসিন কেক জ্বলছে। বরফজল গরম করে, একটু আগে, সেই জলে ইলেকট্রাল গুলে ওরা খেয়েছে। বেশ কিছু আগে সন্ধে হয়েছে। আকাশে মেঘ থাকায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো একটু পরেই আদিগন্ত বরফের ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়বে। ধুধু বরফ, কোথাও একটা লতাগুল্ম বা পাহাড়ি গাছ নেই। এমনিতে অন্যান্য পাহাড়ের চেয়ে হিমালয়ের বয়স অনেক কম। বেশ ওপরেও মাটি আছে। চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট পর্যন্ত জুনিপারের সবুজ বীথি। জুনিপার গাছের ডালপালা কাঁচা অবস্থাতেই জ্বলে। জুনিপার গাছ তাই পাহাড়িদের খুব প্রিয় জ্বালানি। ওরাও বেশ কয়েকবার জুনিপার জ্বেলে রান্না করে খেয়েছে। আরো উঁচুতে বড় বড় পাহাড়ি ছত্রাক আর নানারকমের অর্কিড দেখেছে। তাছাড়া দেখেছে ব্রহ্মকমল। ঘি-রঙের বেশ বড় ফুল পদ্মের মতো দেখতে, কিন্তু পাপড়ি খোলে না। হালকা, মিষ্টি গন্ধ। কেদার বদরীতে ব্রহ্মকমল ছাড়া পুজো হয় না। দশ হাজার ফুটের নীচে ব্রহ্মকমল ফোটে না।

গুহাটা একটা ছোটখাটো ঘরের মতো। শক্ত বরফের খাঁজে খাঁজে বরফ জমে তৈরি হয়েছে। গুহার মেঝে, দেওয়াল, ছাত, সবটাই বরফ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেতরটা বেশ গরম এবং নিরাপদ। জ্বলতে জ্বলতে কেরোসিনের কেকটা একসময়ে নিবে গেল। গুহার মধ্যে অন্ধকার, তবু কোথা থেকে যেন ফিকে আলো এসে পড়েছে। বাইরে বোধহয় চাঁদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার হলে জমাট বরফের ওপর চাঁদের আলো পড়ে ঝলমল করে উঠবে চারপাশ। গুহার মধ্যে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। জল নয়, হয়তো বরফ খসে পড়ছে। জ্বলন্ত কেরোসিনের কেক এতক্ষণ যে অল্প আলো আর তাপ দিচ্ছিল, সেটা পুড়ে যাওয়ায় গুহার ভেতরটা নিমেষে কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। এখানকার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে। ইন্দ্রের ফেদার জ্যাকেটের পকেটে একটা ছোট ব্যারোমিটার আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বার করে দেখার ইচ্ছে ইন্দ্রের নেই। একটু নড়াচড়া করলেই ভীষণ ঠাণ্ডায় হাড়ের ভেতর

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে; আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই। আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2193-BEN

পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠছে। স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক সব পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে রয়েছে। গায়ে গা লাগিয়ে তিনজন পাশাপাশি বসে আছে। পেছনে উত্তরঋষি হিমবাহ। অবিরাম বরফ গড়িয়ে পড়ছে সেখানে। শব্দহীন রাতে বরফের ধস নামার প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

ফিকে আলায় প্রদীপের মুখটা ইন্দ্রনাথ দেখতে পেল। দারুণ আনন্দে প্রদীপ অভিভূত। প্রদীপ হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল,

Men will go till the mountain is there,
For man does not go to the mountains only to climb the peaks,
But to seek something else.
May be beauty, may be danger, may be solitude.
It is an unending unsatiated quest.

প্রদীপের প্রিয় উদ্ধৃতি এটা। দলের সকলেই তার মুখে এটা অনেকবার শুনেছে। প্রদীপের ডায়েরিতে এ রকম বেশ কিছু উদ্ধৃতি লেখা আছে।

রাতটা শেষ হলেই সামিটের দিকে ওরা রওনা দেবে। কোনওমতে রাতটা কাটানো। অমূল্যকে প্রদীপ বলল, "একটা গান শুরু করো।"

রবীন্দ্রসংগীতে অমূল্যর গলা ভাল। ইন্দ্রনাথও খারাপ গায় না। দুজনে একসঙ্গে শুরু করল, "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো···।"

হিমালয়ের বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে মাঝরাতের শব্দহীন তুষারের পৃথিবী দুজনের গানের সুরে গমগম করে উঠল। পরপর তিন-চারটে গান গেয়ে ওরা চুপ করলে আবার গভীর নীরবতা নেমে এল। অমূল্য একটা কেরোসিন কেক জ্বালল। ছোট্ট বাটির মতো একটা স্টোভে টিমটিমে আলো। তবে তাপ আছে। আগুনের ওপর ওদের তিনজোড়া দস্তানাবাঁধা হাত এগিয়ে এল।

প্রদীপ বলল, "বাড়ি ফিরে অনেক কাজ। ব্যবসার জন্যে অনেক ধারদেনা হয়ে গেছে। তাগাদার ঠেলায় লজ্জায় মরে আছি। এবার মন দিয়ে কাজকর্ম করতে হবে।"

"চাকরিটা ছাড়াই তোমার ভুল হয়েছে," ইন্দ্রনাথ চলল।

"চাকরি করার বিপদ আছে," প্রদীপ বলল, "চাকরি করলেই বাড়ি থেকে বিয়ের চাপ আসে। বিয়ে করতেই হয়। আর চাকরি করে, বিয়ে করে পাহাড়প্রেমিক থাকা যায় না।"

প্রদীপের কথা শুনে ইন্দ্রনাথ আর অমূল্য হেসে উঠল। প্রদীপ বলল, "বাবুলাল আর মুনমুনের জন্যে আমার খারাপ লাগছে। সামিটে ওঠার খুব ইচ্ছে ছিল ওদের।"

"কিন্তু মুনমুনের হাতের যা অবস্থা···" ইন্দ্রনাথ বলল।

"ওরা হয়তো আমাদের জন্যে খুব ভাবছে," অমূল্য জানাল।

"কাল বিকেলের আগেই পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছে যাব।" প্রদীপ বলল।

কিছু সময় চোখ বুজে চুপচাপ বসে তিনজনে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু নিদারুণ উত্তেজনা, আনন্দে ঋষিশৃঙ্গের প্রথম তিন ভারতীয় অভিযাত্রীর মাথার মধ্যে তখন নানা চিন্তার ঢেউ উঠছে। ঘুমোবে কী করে?

এই অভিযানের রুট ম্যাপ বা মানচিত্র তৈরি করার দায়িত্ব অমূল্যর। সেই লতাখড়ক থেকে ঋষিপর্বত পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রার ছবিটা সে নিজের স্মৃতিতে সর্বদা উশকে নিচ্ছে। ঘোড়ি পর্বত, রোন্টি পর্বত, ধরানসিপাস, মালথুনিপাস, হনুমাননালা, প্রিদাং এই পর্যন্ত আগের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। তারপর থেকে যাবতীয় বিবরণের তারাই নির্মাতা। কেননা ত্রিশূলনালা আর ত্রিশূল হিমবাহ পেরিয়ে আর কোনও ভারতীয় অভিযাত্রীদল নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারির ভেতরের অংশে ঢোকেনি। সব মনে রাখতে হবে, ভুললে চলবে না।

ইন্দ্রনাথ ভাবছিল তার তোলা ছবিগুলোর কথা। এই অভিযানের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাকে পাঁচজনের কাছে তাকেই নিয়ে যেতে হবে। লতাগ্রামের নন্দাদেবীর মন্দিরের ছবিটা ঠিকঠাক উঠেছে তো? নন্দাদেবী সিদ্ধির প্রতীক, গাড়োয়ালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রডোডেনড্রন জঙ্গলের পাশে পাশে ফুটে থাকা লাল, হলুদ, বেগুনি, সাদা, গোলাপি নানা রঙের ঘাসফুল। কী তাদের গন্ধ, মৌমাছি ভনভন করছে। পাহাড়ের গুহার ভেতর বিরাট মৌচাক, ফোঁটা-ফোঁটা মধু পাথরের ওপর ঝরে পড়ছে। সব ছবি হয়তো উঠবে না, কিন্তু কিছু তো উঠবেই। নন্দাদেবীর ইনার স্যাংচুয়ারিতে ঢোকার সেই অজ্ঞাত, অচিহ্নিত সরু রাস্তাটার নাম দেওয়া হল, কে এফ কল, কাঞ্চনজঙ্ঘা ফাউণ্ডেশন কল। নামকরণের পর এক টুকরো কাপড়ে নামটা লিখে পথের ধারে টাঙিয়ে দেওয়া হল। পাশে রাখা হল ক্লাবের ঝাণ্ডা। ক্লিক, ক্লিক, অনেকগুলো ফোটো তুলেছিল ইন্দ্রনাথ। কাঁধের ক্যামেরার মধ্যে সব ছবি আলোকিত হওয়ার দিন গুনছে।

অন্তত ঘন্টাখানেক এই গুহার মধ্যে ঘুমোলে শরীরে নতুন শক্তি পাওয়া যাবে। চোখ বুজে বসে থাকলেও প্রদীপের ঘুম আসছিল না। মাথার মধ্যে এলোমেলো হরেক চিন্তা, গুছিয়ে ভাবতে পারছে না কিছু। বিকেল থেকে ডান কানের পাশে একটা ব্যথা হয়েছে। ক্রমশ বিষফোঁড়ার মতো টাটিয়ে উঠছে ব্যথাটা। ইন্দ্রনাথ বা অমূল্যকে ব্যথার কথা প্রদীপ জানায়নি। ঠাণ্ডা লেগেছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে ফিরে দুটো পেনকিলার ট্যাবলেট খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া এক প্রবল আনন্দে তার মন থৈ-থৈ করছে। কাল বিকেলের মধ্যেই ঋষিপর্বত জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়বে। প্রথম ভারতীয় বিজয়ী দলের সে অধিনায়ক। এই দুরারোহ, দুর্গম শিখর জয়ের সে নেতা, এটা কম কথা নয়। কথা ছিল বৈমানিক হওয়ার। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে শিক্ষানবিশি শেষ করে পুরোদস্তুর বৈমানিক হওয়ার জন্যে আমেরিকায় ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মার আপত্তিতে যাওয়া হল না। তার বদলে হল কনভয় ড্রাইভার। চাকরির সুবাদে গোটা ভারতবর্ষ ঘোরা হয়ে গেছে তার। তখনই পাহাড়ে চড়ার নেশা লাগল। সেই নেশার ঘোরেই জীবনবিমার ভাল চাকরিটা সে নেয়নি। বাবা-মা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু কী করা যাবে?

কেরোসিনের কেকটা নিবে গেছে। অন্ধকার বরফের গুহার মধ্যে বসে প্রদীপের বারবার বাবা-মা ভাইবোন আত্মীয়-বন্ধুদের কথা মনে পড়ছিল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : অনুপ রায়

খেলা যবে সত্যি হবে
পিয়ারলেসকে
মনে রবে
আজ পুতুলখেলা। কাল আসবে
সত্যিকারের ঘর-সংসারের পালা।
সেদিনের জন্যে আজ থেকেই
তৈরি হওয়া চাই।
আজকের সামান্য সঞ্চয়ই
গড়ে তুলবে সুন্দর
ভবিষ্যৎ।
সরকারী তহবিলে মোট
লগ্নী ৫০০ কোটী টাকার ঊর্দ্ধে
দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯
স্থাপিত ১৯৩২
ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান
PRASA/PGF-142/85

নীলকান্তমণি-রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : কাঁধে মরা হাঁস ঝুলিয়ে একটা লোক হাঁটছিল। গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করতে সে লাঠি ঘোরাতে থাকে। পুলিশ কমিশনার ওই অবস্থায় তাকে সাহায্য করতে গেলে টুপি ও হাঁস ফেলে সে পালায়। টুপি দেখে হোম্‌স লোকটার সম্পর্কে বলছেন, এককালে সে হিসেবি ছিল, তার মাথার চুলে পাক ধরেছে, তার বাড়িতে গ্যাস নেই, বউয়ের সঙ্গে মন-কষাকষি চলছে। লোকটার অবস্থা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়নি। মরা হাঁসটা আজ পুলিশ কমিশনারের ভোজে লাগবে। হোম্‌সের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। তারপর···

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পুলিশ কমিশনার পিটারসন। তার চোখমুখ দেখে মনে হল, কোনও ব্যাপারে সে এমন আশ্চর্য হয়েছে যে, তারই ধাক্কায় সে বেচারা একেবারে বেসামাল। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, "সেই হাঁসটা ! মিঃ হোম্‌স, সেই হাঁসটা !" শুনে হোম্‌স বলল, "হ্যাঁ, সেই হাঁসটা ! তা সেটার হয়েছে কী ? ফের জ্যান্ত হয়ে, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সেটা কি রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে পালাল ?" কথাটা বলে হোম্‌স একটু নড়েচড়ে বসল, যাতে সে পিটারসনের মুখটা আর-একটু ভাল করে দেখতে পায়।

"এই যে দেখুন না, মরা হাঁসের পেটের ভেতর থেকে আমার স্ত্রী কী পেয়েছেন।"

পিটারসন তার হাত আমাদের সামনে মেলে ধরলে। তার হাতের তেলোয় একটা খুব চকচকে নীল পাথর। পাথরটা আকারে একটা মটরশুঁটির দানার মতো, হয়তো একটু ছোটও হতে পারে। কিন্তু পাথরটা এত ভীষণ জ্বলজ্বলে যে, মনে হচ্ছিল পিটারসনের হাত থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়েছে।

হোম্‌স মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলে। "পিটারসন, এ যে একেবারে গুপ্তধন পাওয়া। তুমি কী পেয়েছ তুমি জানো কি ?"

"এটা একটা হিরে। আর হিরে তো খুব দামি পাথর। এটা দিয়ে খুব সহজেই কাঁচ কাটা যায়।"

"এটা যত দামি পাথর আছে তার মধ্যে সব চাইতে দামি।"

"এটা মরকারের কাউন্টেসের সেই নীলকান্তমণি নাকি ?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"ঠিক বলেছ। দু-চারদিনের মধ্যে 'দি টাইমস' পত্রিকায় রোজ যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তা পড়ে পড়ে এই পাথরটার আকার-আকৃতি আমার নখদর্পণে বলতে পারো। এটা যাকে বলে অতুলনীয়। এর আর জোড়া নেই। বাজারে এটার যে কত দাম হবে তা আন্দাজ করাও শক্ত। তবে এটা খুঁজে দিতে পারলে যে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবার কথা বলা হয়েছে তা এই পাথরটার দামের কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয়।"

"এক হাজার পাউণ্ড ! আরেব্বাস !" পিটারসন এই বলেই একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে একবার আমার আর একবার হোম্‌সের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

"পুরস্কার হিসেবে হাজার পাউণ্ডের কথা বলা হয়েছে। তবে আমি যতদূর জানি তাতে বলতে পারি যে ওই নীলকান্তমণিটা ফিরে পাবার জন্যে কাউন্টেস তাঁর সম্পত্তির অর্ধেকও দিয়ে দিতে পারেন।"

আমি বললুম, "আমার যতদূর মনে পড়ছে এটা কসমোপলিটান হোটেল থেকে চুরি হয়ে যায়।"

"ঠিকই বলেছ। আজ থেকে পাঁচ দিন আগে, মানে ২২ ডিসেম্বর এটা চুরি যায়। জন হর্নার নামে একজন কলের মিস্ত্রিকে এটা চুরি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। হর্নারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এতই গুরুতর যে, তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। দাঁড়াও, আমার কাছে বোধহয় কাগজপত্র সবই আছে।" হোম্‌স তার চেয়ারের চারপাশে যে-সব কাগজ ছড়ানো ছিল সেগুলো ঘাঁটতে শুরু করলে। তারপর একটা কাগজকে বেশ সমানভাবে দু-ভাঁজ করে নিয়ে তার থেকে পড়তে লাগল :

কসমোপলিটান হোটেল থেকে দামি পাথর চুরি। ছাব্বিশ বছর বয়সী কলের জলের মিস্ত্রি জন হর্নারের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সে মরকারের কাউন্টেসের বিখ্যাত 'ব্লু কারবাঙ্কল' নামে পরিচিত অত্যন্ত মূল্যবান পাথরটি চুরি করেছে। হোটেলের ওপরতলাগুলির তদারকির ভার যার ওপর সেই জেমস রাইডারই এই অভিযোগ করেছে। কাউন্টেসের ঘরের একটা ভাঙা চুল্লি ঝালাই করবার জন্যে রাইডার হর্নারকে ডেকে নিয়ে আসে। হর্নার যখন কাজ করছিল রাইডার তখন ওই ঘরেই ছিল। হঠাৎ তাকে কাজের জন্যে অন্য জায়গায় যেতে হয়। ফিরে এসে রাইডার দেখে হর্নার চলে গেছে। কিন্তু সে লক্ষ করে যে ঘরের দেরাজটা ভাঙা। আর টেবিলের ওপরে একটা ছোট্ট মরক্কোর চামড়ার কৌটো খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে জানতে পারা যায় যে, ওই কৌটোতেই 'ব্লু কারবাঙ্কল' রাখা ছিল। রাইডার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করে ঘটনার কথা সকলকে জানিয়ে দেয়। সেই দিনই সন্ধেবেলায় পুলিশ হর্নারকে গ্রেফতার করে। যদিও তার ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পাথরটা পাওয়া যায়নি। কাউন্টেসের নিজের ঝি ক্যাথরিন কুসাক সাক্ষি দিতে গিয়ে বলে যে, রাইডারের চিৎকার শুনে সে ঘরে ছুটে গিয়ে দেখে যে, কাউন্টেসের দেরাজ ভাঙা আর টেবিলের ওপর কৌটো খোলা। মোটমাট ক্যাথরিন কুসাক রাইডারের কথায় সায় দেয়। এর পর বি ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারের গ্রেফতারের ব্যাপারে সাক্ষি দিয়ে বলে যে, তাকে গ্রেফতার করতে গেলে সে প্রচণ্ড বাধা দেয় আর বারবার বলতে থাকে যে, তার কোনও দোষ নেই। সে এ ব্যাপারের কিছুই জানে না। হর্নারের বিরুদ্ধে আগে ছিঁচকে চুরির অভিযোগ থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট তখনই কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচারের জন্যে আদালতে পাঠিয়ে দেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় হর্নার আগাগোড়া খুবই অস্থির আর উত্তেজিত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে ধরাধরি করে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে নিয়ে যেতে হয়।

"হুঁ, এই তো গেল পুলিশ কোর্টের খবর।" খবরের কাগজের পাতাটা পাশে সরিয়ে রেখে হোম্‌স বললে। হোম্‌সের হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, সে যেন বেশ ভাবনায় পড়ে গেছে।

"এখন যে প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে সেটা হল কী ভাবে ওই পাথরটা চুরি গেল আর কী করেই বা সেটা টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের একটা বাড়ির রান্নাঘরে একটা মরা হাঁসের পেট থেকে বেরুল। ...এখন তো দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন যে আমাদের ওই বিশ্লেষণের ব্যাপারটা কত গুরুতর চেহারা নিয়েছে। এখন আর ওই ব্যাপারটা মোটেই নির্দোষ নেই। এই দেখো পাথরটা। পাথরটা পাওয়া গেছে একটা হাঁসের পেট থেকে। আর হাঁসটা হচ্ছে মিঃ হেনরি বেকারের, মানে সেই লোকটির যার পুরনো ছেঁড়া-ফাটা টুপিটা আমাদের হাতে এসেছে। আর তার সম্বন্ধে কিছু-কিছু কথা আমি তোমাকে বলেছি এবং যে কথাগুলো তুমি তেমন গ্রাহ্য করোনি। এখন আমাদের প্রথম কাজ হল ওই লোকটিকে খুঁজে বের করা। তারপর আমাদের জানতে হবে যে, ওই রহস্যময় ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ আছে কি না। আর তা করতে হলে প্রথমেই সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা আমাদের নেওয়া উচিত। আমরা সব সান্ধ্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। যদি বিজ্ঞাপনে কোনও ফল না হয় তো অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

"বিজ্ঞাপনটা কীভাবে দেবে ভাবছ?"

"আমাকে একটা কাগজ আর পেন্সিল দাও। দাঁড়াও, এইভাবে লিখলে কেমন হয়:—

> গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা হাঁস আর একটা ফেল্ট টুপি পাওয়া গেছে। মিঃ হেনরি বেকার, ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে সন্ধে সাড়ে-ছ'টার পর নিজে এসে দেখা করলে তাঁর জিনিস ফেরত পাবেন।

"কী, সব বেশ পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলা হয়নি?"

"তা হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে এ বিজ্ঞাপন কি তার নজরে পড়বে?"

"দ্যাখো, একজন গরিব লোকের পক্ষে এইভাবে একটা হাঁস ফেলে আসা সোজা ব্যাপার নয়। বেশ বড় রকমের একটা লোকসানই বলা যায়। একে তো দোকানের কাঁচের শার্সি দৈবাৎ ভেঙে ফেলে বেচারা ঘাবড়ে যায়, তার ওপর আবার পুলিশের পোশাক-পরা পিটারসনকে ছুটে আসতে দেখে সেই জায়গা থেকে পালানোর কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারেনি। আমার মনে হয় যে, পরে ঐভাবে হাঁসটা ফেলে আসার জন্যে সে নিশ্চয়ই খুব আফসোস করছে। আর তাছাড়া আমরা তো বিজ্ঞাপনে নাম দিয়ে দিচ্ছি। তাই ও নিজে যদি না-ও দেখে তো ওর চেনা-শোনা কেউ দেখতে পেলে নিশ্চয়ই ওকে বিজ্ঞাপনের কথা বলবে। ... পিটারসন এই বিজ্ঞাপনটা কোনও বিজ্ঞাপন কোম্পানির মারফত আজ-ই ছাপাবার ব্যবস্থা করো।"

"কোথায় দিতে বলছেন?"

"গ্লোব, স্টার, পলমল, সেন্ট জেম্‌সেস্ গেজেট, ইভনিং নিউজ, স্ট্যাণ্ডার্ড, একো, এগুলোকে দাও। আর, এ ছাড়া অন্য যেখানে দিতে চাও দিও।"

"ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ... আর ওই পাথরটা?"

"ওটা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, বিজ্ঞাপন দিয়ে যখন ফিরে আসবে তখন সেই হাঁসটার সাইজের একটা হাঁস কিনে এনো। যে লোকটির হাঁসটা এখন তোমার রান্নাঘরে ডেকচিতে টগবগ করে ফুটছে, সে এলে তাকে তো একটা কিছু দিতে হবে।"

পিটারসন চলে যাবার পর হোম্‌স সেই পাথরটা আলোর সামনে ধরলে।

"দারুণ জিনিস। দেখছ কেমন চকচক করছে। এটার চারদিক দিয়ে আলো একেবারে ঠিকরে বেরুচ্ছে। বুঝতেই পারছ যত গণ্ডগোলের মূল হল এই পাথরটি। সত্যি কথা বলতে কী, দামি পাথর বোধহয় এমনই টোপ যা অপরাধীরা না গিলে পারে না। পৃথিবীতে যতগুলো বিখ্যাত দামি পাথর আছে তাদের প্রতিটার জন্যেই কত যে চুরি আর খুন-জখম হয়েছে তা বোধহয় বলে শেষ করা যায় না। এই পাথরটার কথাই ধরো না। এর বয়েস মাত্র কুড়ি বছর। এটা পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ চিনের আময় নদীর তীরে। এ পাথরটার বিশেষত্ব হল যে, এটা দেখতে হুবহু কারবাঙ্কলের মতো, শুধু রঙটা চুনির মতো লাল নয়, নীল। এর বয়েস কম বটে, কিন্তু এর ইতিহাস বড় সাধারণ নয়। এটির জন্যে ইতিমধ্যেই দু'জন খুন হয়েছে, একজনকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা হয়। একজন আত্মহত্যা করেছে। আর এটা যে কতবার চুরি গেছে তা বোধহয় বলে শেষ করা যায় না। এত কাণ্ড ঘটে গেছে শুধু মাত্র চল্লিশ গ্রেন ওজনের এক টুকরো স্ফটিকায়িত কাঠকয়লার জন্যে। যাকগে, এখন এটাকে ভাল করে তুলে রেখে কাউণ্টেসকে একটা চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে দিই।"

"তোমার কি এই হর্নার লোকটাকে নির্দোষ বলে মনে হয়?"

"আমি বলতে পারছি না।"

"আর ওই হেনরি বেকার লোকটি কি এই ব্যাপারের মধ্যে আছে নাকি?"

"আমার মনে হয় হেনরি বেকার বোধহয় নির্দোষ। আমার বিশ্বাস যে, ওই হাঁসটা যে সোনার চেয়েও দামি এ কথা বোধহয় ও জানতই না। অবশ্য আমার এ ধারণাটা ঠিক না বেঠিক সেটা জানতে পারব যদি আমার এই বিজ্ঞাপনটা তার নজরে পড়ে।"

"ততক্ষণ তাহলে তুমি কিছুই করছ না?"

"না, কিছুই না।"

"তবে আমি একচক্কর রুগি দেখে আসি। সন্ধে ছ'টা নাগাদ ফিরে আসব। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা না জানতে পারলে ঘুম হবে না।"

"বহুত আচ্ছা। তাহলে রাত্তিরে ডান হাতের কাজটা এখানেই সারবে। আজ বনমুর্গি আছে। তবে যেসব কাণ্ড ঘটছে তাতে মিসেস হাডসনকে বলে রাখতে হবে মুর্গিটা যেন ভাল করে খুঁজে-টুজে দেখে।"

এক জায়গায় একটু আটকে পড়েছিলুম। যখন বেকার

স্ট্রিটে ফিরে এলুম তখন সাড়ে-ছ'টা বেজে গেছে। সদর দরজার কাছে আসতে দেখলুম লম্বামতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার কোটের গলা পর্যন্ত বোতাম আটকানো। আমি তার পিছনে এসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। আমরা দু'জনে ঢুকে গেলুম। আমরা সোজা হোম্‌সের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

হোম্‌স তার আরামকেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বেশ একগাল হেসে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনি নিশ্চয়ই মিঃ হেনরি বেকার ? আগুনের পাশের ওই চেয়ারটায় বসুন। আজকে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। আপনি দেখছি উপযুক্ত জামা-কাপড় পরেননি। ... আরে আরে ওয়াটসন, তুমিও ঠিক সময়েই এসে পড়েছ দেখছি। আচ্ছা মিঃ বেকার, এই টুপিটা কি আপনার ?"

"হ্যাঁ, এ টুপিটা আমারই বটে।"

লোকটির শরীর বেশ মজবুত। লম্বা। কাঁধ বেশ চওড়া। মাথাটা প্রকাণ্ড। লোকটির মুখে-চোখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। ছুঁচলো কাঁচা-পাকা দাড়ি। নাকের ডগা আর গাল দুটো লাল। লক্ষ করলুম মাঝে-মাঝেই তার হাত দুটো কেঁপে উঠছে। তার গায়ের গলাবন্ধ ফ্রক কোটটা বহু পুরনো। কোটের ভেতর দিয়ে তার হাতের কব্জি দেখা যাচ্ছিল। বুঝলুম তার কোটের ভিতরে শার্ট নেই। লোকটি খুব থেমে থেমে আস্তে কথা বলছিল। আর যা বলছিল তা-ও বেশ ভেবে-চিন্তেই বলছিল। কথার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, সে মোটামুটি শিক্ষিত। তবে এখন যে-কোনও কারণেই হোক সে বেশ অসুবিধের মধ্যে আছে।

"আপনার জিনিসগুলো ক'দিন হল আমাদের কাছেই আছে। আমি ভেবেছিলুম যে আপনি হয়তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। আপনি কোনও বিজ্ঞাপন দেননি তো ?"

লোকটি মাথা নিচু করে লজ্জিতভাবে হেসে বললে, "এখন আর আগেকার মতো পকেটের জোর তো নেই। আর আমার মনে হয়েছিল যে, গুণ্ডার দল হাঁস আর টুপি নিয়ে ভেগেছে। ওগুলো পাবার আর কোনও আশা নেই ভেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করতে চাইনি।"

"সেটা অবশ্য একটা কথা বটে। ভাল কথা, আমরা কিন্তু হাঁসটা রেঁধে খেয়ে ফেলেছি।

"খেয়ে ফেলেছেন !" লোকটি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মনে হল ভেতরে-ভেতরে সে খুবই চটেছে।

"হ্যাঁ। নইলে ওটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে টেবিলের ওপরে ওই যে হাঁসটা দেখছেন ওটা বোধহয় আপনার হাঁসটার মতোই হবে। ওটাতে কি আপনার কাজ চলবে ?"

টেবিলের দিকে তাকিয়ে মিঃ বেকার বেশ খুশি হয়েই জবাব দিলে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

"তবে আপনার সেই হাঁসটার পালক পা সবই রাখা আছে। যদি—"

লোকটি হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "ওইগুলো সে রাতের অ্যাডভেঞ্চারের সাক্ষী হিসেবে খুবই দামি বটে, কিন্তু ওগুলো আর কী কাজে লাগবে জানি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি ওই চমৎকার গোটা হাঁসটাই নিয়ে যাই।"

হোম্‌স আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে কাঁধদুটো অল্প ঝাঁকালে। তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, "তাহলে এই নিন আপনার টুপি আর ওই আপনার হাঁস।

ভাল কথা, যদি আপত্তি না থাকে তো ওই হাঁসটা কোথায় কিনেছিলেন বলবেন কি ? আমি আবার ওই হাঁস-মুর্গির ব্যাপারে ভীষণ ইন্টারেস্টেড কিনা। সত্যি কথা বলতে কী ও-রকম হৃষ্টপুষ্ট হাঁস আমি খুব কমই দেখেছি।"

"বলছি," বলে হেনরি বেকার উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তার জন্যে রাখা হাঁসটা তুলে নিয়ে বগলদাবা করলে। "মিউজিয়মের কাছে 'আলফা ইন' বলে একটা রেস্টুর‍্যাণ্ট আছে। আমরা কয়েকজন সেখানে রোজই সন্ধের দিকে জড়ো হই। দিনের বেলাটা অবশ্য আমি মিউজিয়মেই থাকি। এ-বছর আলফা ইনের মালিক উইণ্ডিগেট 'গুজ ক্লাব' বলে একটা ক্লাব তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য—সপ্তাহে-সপ্তাহে কয়েক পেনি করে দিলে ক্রিসমাসের সময় একটা করে হাঁস পাওয়া যাবে। আমি আমার চাঁদা নিয়মিত দিয়ে গেছি। তার পরের ব্যাপার তো সবই আপনার জানা।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

তোমরা কি জানো, আটলান্টিক মহাসাগর ক্রমশ বড় হচ্ছে আর প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন ক্রমেই কমে যাচ্ছে ? খবর রাখো, ভূমধ্যসাগর বলে কিছু আর থাকবেই না শেষ পর্যন্ত ? এ-সব কথা ভূতত্ত্ববিদ্‌দের।

জানো কি, পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী জীবনধারণ করে পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রাণীদের খেয়ে ? কোনো-কোনো জাতির তিমি মাছের খাদ্য হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্কটন, অণুবীক্ষণ ছাড়া যাদের দেখাই যায় না।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব তৈ তৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

সহস্রবুদ্ধি আটা মেখে রুটি গড়তে বসল, সদাশিব দু'হাতে কয়লা নিয়ে মাটির ওপর লম্বালম্বি ভাবে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

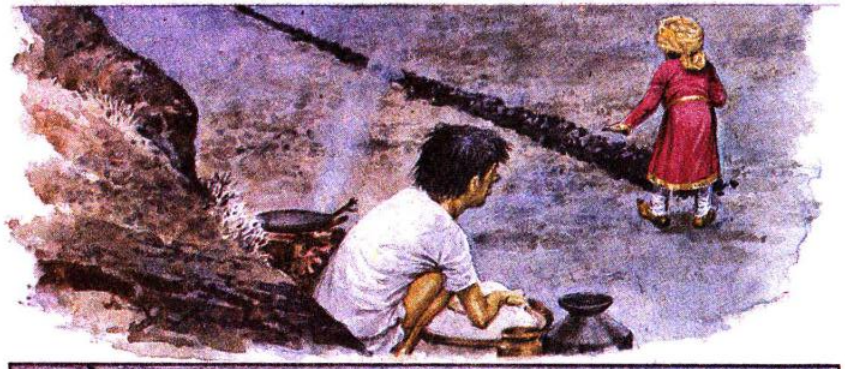

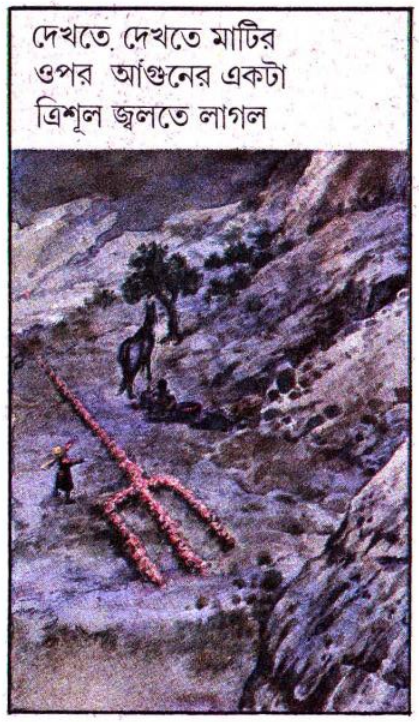

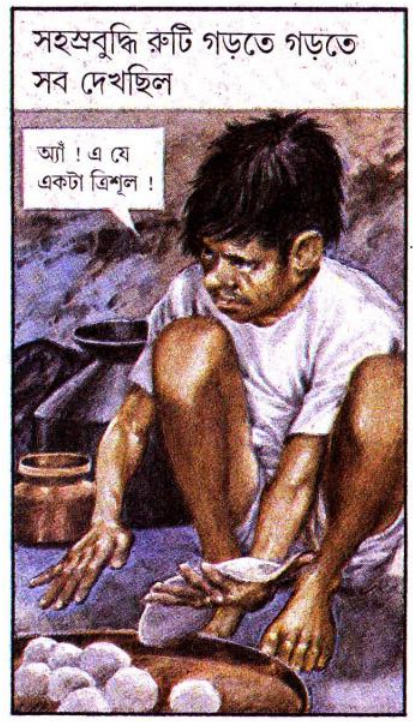

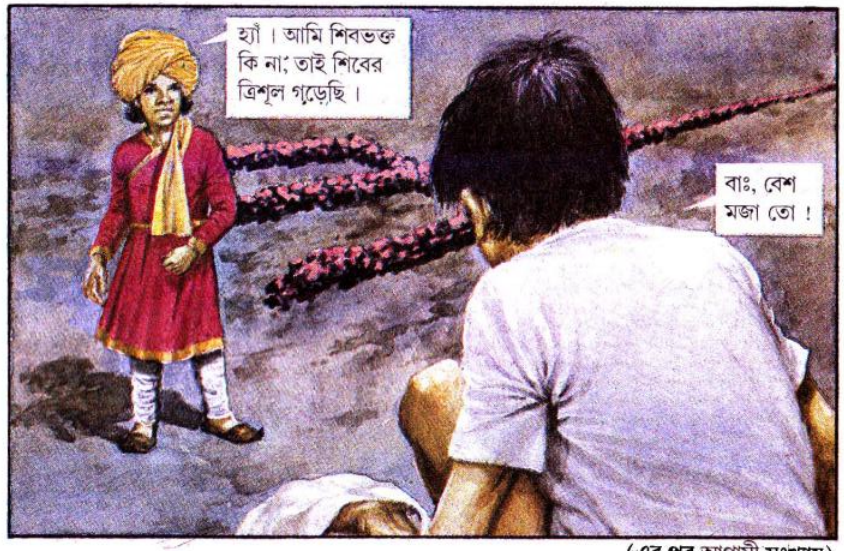

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

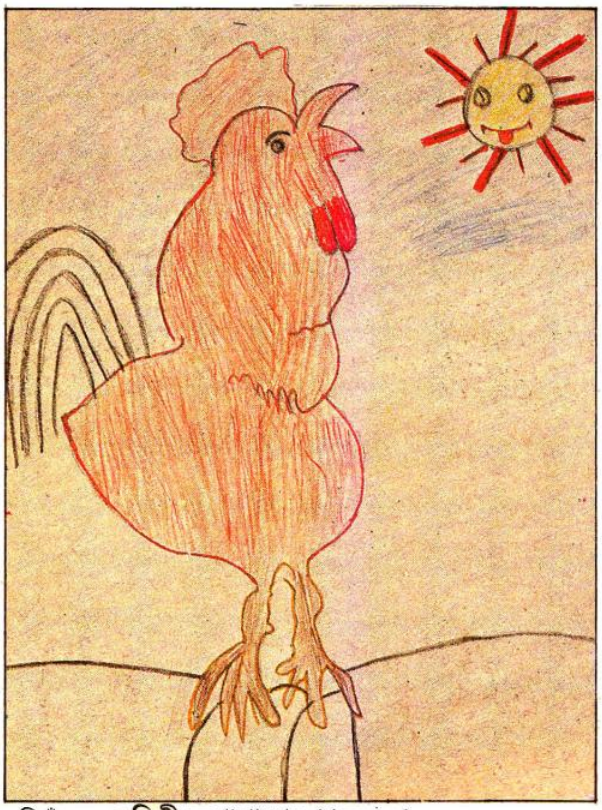

ছবি এঁকেছে **নন্দিনী মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১২)

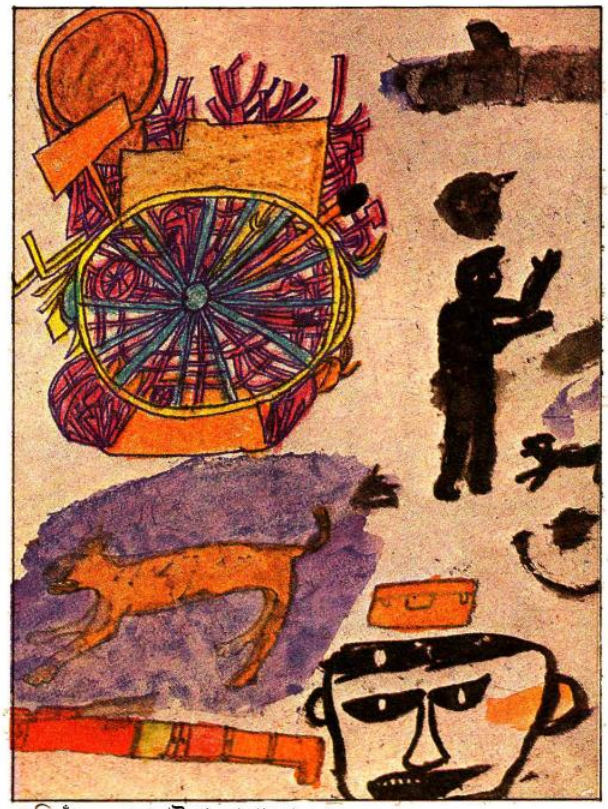

ছবি এঁকেছে **সম্রাট গঙ্গোপাধ্যায়** (বয়স ৮)

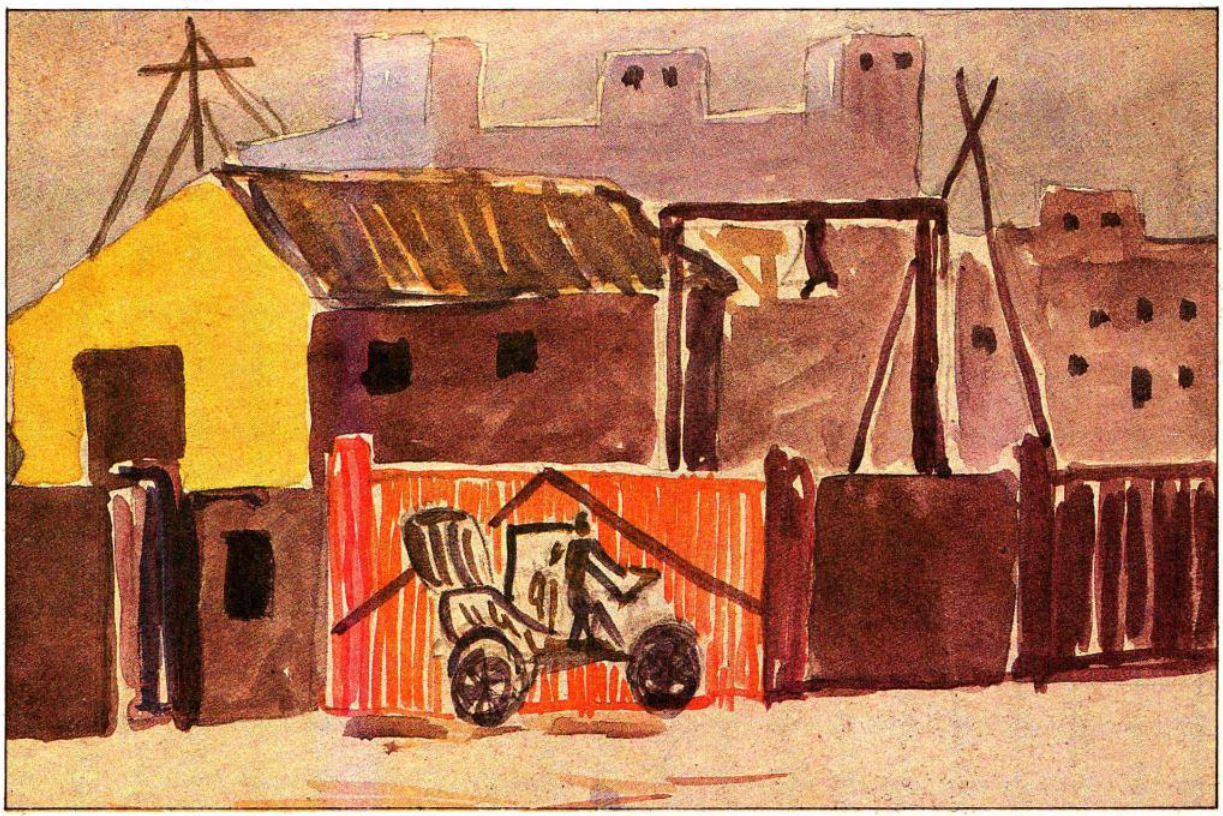

ছবি এঁকেছে **শান্তনু চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ১১)

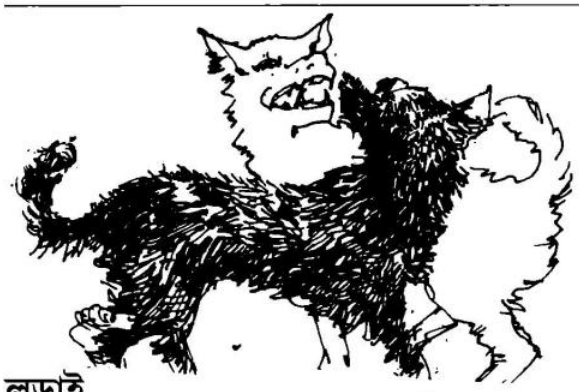

লড়াই

আমাদের লাকি আর টমির মধ্যে দারুণ ঝগড়া। একদিন হয়েছে কী, লাকিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দাদাইদের বাড়ি থেকে। লাকি অমনি এসে ঢুকে পড়ল আমাদের বাড়িতে। লাকিকে দেখে টমি ভৌ-ভৌ করে ডাকতে লাগল। তারপর দুজনে কামড়া-কামড়ি করল। তার পরে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল।

একটু বাদে তারা চলে গেল ও-বাড়ির ভুটুর সঙ্গে লড়াই করতে। প্রথমে ভুটু লাকিকে মারল। টমি দিল ভুটুকে এক কামড়। তারপর তারা যেই সেই বাড়িতে ঢুকতে যাবে অমনি ভুটুদের বাড়ি থেকে একটা ছেলে ছুটে এল টমিকে ধরতে। তাই না দেখে লাকি আর টমি দৌড়ে ফিরে এল বাড়িতে।

রাজর্ষি সরকার (বয়স ৭)

বাপ শিকারে গেলে

বাঘ-ভালুক দুই বন্ধু
থাকত এক বনে
বাঘ দেবে বন্ধুর বিয়ে
দেখতে গেল কনে
কনের একটা পা খোঁড়া
কিন্তু এক পা ভাল
একটা চোখ কানা
রঙটা বড়ই কালো
পরের বছর বউটির
একটা হল ছেলে
সে কেঁদে কেঁদে খুন হত
বাপ শিকারে গেলে

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ছুঁস না

লণ্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক
একহাতে নাইফ, অন্যহাতে ফর্ক
হনলুলু, হাওয়াই, কুয়ালালামপুর—
যাচ্ছিস কোথায় ? এখন ভরদুপুর।
চিন, জাপান, ভারত, রাশিয়া।
ছুঁস না ছুঁস না, হয়েছে ডিপথেরিয়া।

সূর্যসারথি জোয়ারদার (বয়স ১২)

ছবি এঁকেছে **ইন্দ্রজিৎ মহাপাত্র** (বয়স ৮)

নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল কালো, কিন্তু ...

খেলা

শান্তিকুমার মিত্র

"হামায় খেলতে লেবে ?" আদুল গা, ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, গলায় একটা বড় মাদুলি, ছেলেটি অনুনয় করে ওদের। ওরা ফুটবল খেলার তোড়জোড় করছিল। আমি ওদের ক'জনকে চিনি। বাসে বসে থাকতে-থাকতে ওদের রোজ দেখি। অশোক তেড়ে যায় ছেলেটিকে, "দূর, দূর, তোকে নিয়ে কে খেলবে ?" সঙ্গীরা হেসে ওঠে। ছেলেটি কেমন মুষড়ে পড়ে, মৃদু স্বরে বলে, "হামি গোলে খেলবে।" "না, না," অন্যরা চেঁচিয়ে ওঠে, "কুলির ছেলেদের সঙ্গে খেলি না।" সটান রায় দিয়ে মাঠে বল ফেলে ওরা দৌড় শুরু করে দেয়। বিষণ্ণমুখ ছেলেটি আস্তে-আস্তে মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়।

আমার মনটাও কেমন খারাপ হয়ে পড়ে।

এটা একটা পোড়ো মাঠ। আসলে ময়লা ফেলার গাদা ছিল। এখন মাঠ হয়েছে। একটা কম-দূরত্বের বাসের স্ট্যাণ্ডও বটে। রাস্তায় না দাঁড়িয়ে বাস গিয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে মুখের কাছটায় দাঁড়ায়। একটা গাছতলায় টাইমকিপার বসেন। শীতের সময় ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন স্কুলের স্পোর্টস হয় এ-মাঠে। মাঠে তখন শোভা ধরে। রঙিন কাগজের শিকলি ঝোলে, চুন দিয়ে ট্র্যাক কাটা হয় ; নানা রঙের পতাকা সীমানা নির্দেশ করে।

ওই স্ট্যাণ্ডে নিত্য বাসে উঠি অফিস যেতে। ফুটবল মরসুমে সকালেই দেখি, কিশোররা দাবড়িয়ে ফুটবল খেলছে। স্কুলে স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। ফুটবল খেলাও জমে উঠেছে।

আমার বাসস্ট্যাণ্ডে আসার সময়টা বাঁধা। দাঁড়ানো বাসে উঠে, মিনিট পনেরো তো বটেই, বসে থাকি। খেলা দেখি। খেলুড়েরা অচেনাও অনেকে। তবে দেখে মনে হয়, সব মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কখনও কোনও সহযাত্রী ওদের মধ্যে কাউকে ডেকে বলে যান, "রেশনটা তুলিস্ রে।" বুঝি, বাড়ির ছেলে। ওদের কলহাস্যভরা খেলা, উৎসাহদীপ্ত মুখ দেখতে বড় ভাল লাগে। নিজের কৈশোরের কথা মনে পড়ে।

মাঝে-মাঝেই দেখে আসছিলাম, একটা বাচ্চামতো ছেলে, আদুল গা, মাঠের ধারে এসে ওই সময়টা দাঁড়িয়ে থাকে। দেখলেই মায়া লাগে। কাদের ছেলে ? সেই ছেলেটিই এদিন অনেক সাহস করে মুখ ফুটে খেলতে চেয়েছিল। নিরাশ হয়ে ও ফিরে গেল। মনে মনে ওর নাম দিলাম 'কালো'। কালো কুলিদের ছেলে শুনলাম, কিন্তু কোথায় থাকে ? সারাক্ষণ অফিসে মনটা খারাপ হয়ে রইল।

তারপর ক'দিন ওকে আর দেখতে পেলাম না। রোজই কালোকে খুঁজি মনে মনে। কিন্তু কালো যেন অভিমানভরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

একদিন বেটাইমে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসেছি। তখন মাঠ ফাঁকা। বেশ দুপুর। হঠাৎ দেখি, মাঠের চৌহদ্দির ভেতর রাস্তার দিকের দেওয়াল ঘেঁষে নিমগাছটার বাঁধানো চাতালে কালো উবু হয়ে বসে আছে। একটি রোগা, ওর চেয়েও কালো, শিশু ওর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ওদিকটায় দেখি ক'টা ঝুপড়ি রয়েছে। মাঝে-মাঝে নজরে পড়ে, শুয়োর চরছে। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে শুয়োরগুলো কী যে খায়। কখনও আবার বাসের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় চরতে বেরোয় ওরা। পৌরসভার ক'ঘর সাফাইকর্মী ওই ঝুপড়িতে থাকে। ওঃ, তাহলে কালো

মেলা শিশুর মেলা

কলকাতার জওহর শিশুভবনে মাত্র চার দিনের ক্যাম্প করতে এসে কী আনন্দই না করে গেল 'নানা ভাষা নানা জাতি নানা পরিধান'এর ছেলেমেয়েরা। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছোট ছোট শিশুরা এসেছিল এখানে। জওহর শিশুভবনে থেকে, হৈহৈ করে তারা চারটে দিন কাটিয়ে দিল। এরই মধ্যে ছিল নানা প্রোগ্রাম। কখনও বসেছে নাচগান, আবৃত্তি আর বাজনার আসর, কখনও মডেল তৈরি, পেপার কাটিং শেখানো হয়েছে, কখনও খেলাধুলার আসর বসেছে, আবার কখনও দিনের সারাটা সময় কেটে গেছে কলকাতার নানা জায়গা দেখতে গিয়ে। বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, জাদুঘর ইত্যাদি দ্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ করে সমবেত শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল। শেষ দিনটিতে তারা পাতাল রেলে চড়ে, কেনাকাটা করে আবার শিশুভবনে ফিরে এল। এদিন সন্ধেবেলা নানা রাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের শেষে সকলেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হাতে নিয়ে খুশি মনে ফিরে গেল।

ভারতের নানা জাতি ও নানা ভাষার শিশুদের এখানে এসে থেকে যাবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'লার্ন টু লিভ টুগেদার'। একসঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে থাকতে শেখা। আসাম, ওড়িশা, গুজরাট, পণ্ডিচেরি, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও দিল্লি এই সাত রাজ্যের শিশুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার অজ পাড়াগ্রামের আদিবাসী ছেলেমেয়েরাও এই বিরাট উৎসবে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এমনও আদিবাসী শিশুকে দেখা গেছে যাদের পরনে একটা প্যান্ট, গায়ে একটা সাধারণ জামা, আর শীতের পোশাক সামান্য একটা সুতির চাদর। তারাও তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে জওহর শিশুভবনে এসে, মঞ্চে উঠবার সুযোগ পেল, অনুষ্ঠান করল, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করল। একসঙ্গে মিলেমিশে এই চারটে দিন তারা কাটিয়ে গেল জওহর শিশুভবনের শিশু-ভালবাসার কল্যাণে

পৃথা বল

ওদেরই কারও ছেলে। শুয়োর সব ওদেরই পোষা। কেন জানি না তখন আর কালোর জন্য মন খারাপ লাগে না। নিজের মনেই কখন অজান্তে যুক্তি দিই, ওই পরিবেশে কি কেউ ভাল থাকে ? নিশ্চয়ই গালিগালাজ শিখেছে ও। খেলতে গিয়ে ঝগড়া করবে, মুখ খারাপও করতে পারে। না, ওকে খেলতে না নিয়ে ছেলেরা ঠিকই করেছে। যেন খানিকটা স্বস্তি পাই।

দিন কাটে। তেমনি গতানুগতিকভাবে যাওয়া-আসা করি। খেলা দেখি। নতুন কিছু ঘটে না। মনে-মনে কখন কালো-পর্বেরও প্রায় সমাধি ঘটিয়ে দিয়েছি। মিথ্যে বলব না, হঠাৎ কখনও মনে হয়েছে বটে, ওই পরিবেশের জন্য ও কি দায়ী ? তা ছাড়া আমাদের নিজেদের সংসারের পরিবেশই কি খুব সুস্থ ! না, ও চিন্তাটাকে বাড়তে দিই না, ঝেড়ে ফেলি। ভেবে নিই, এমন-ই ঘটে ; এই-ই স্বাভাবিক।

মধ্যে একদিন সকালে আগের বাসটায় যাওয়ার জন্য বেরিয়েছি। ওঃ হরি। মাঠে এ কী ব্যাপার ? একটি বাতাবিলেবু নিয়ে কালো মাঠে খেলছে, তার সঙ্গে ছোটাছুটি করছে গোটা-ছয় শুয়োরছানা। খেলুড়ে ছেলেরা তখনও আসেনি। কালো 'বল' মারে, মেরেই তার পিছনে ছোটে, কালোর সঙ্গে ছোটে শুয়োরছানারা। ঠিক ঘোঁত-ঘোঁত নয়, যেন কিত-কিত ধরনের কী একটা আওয়াজ হয়। খুব মজা লাগে দেখতে।

এক-এক-এক করে ছেলেরা এসে পড়ে। মাঠে ঢোকে ওরা ক'জন। একজন বলে, "এই হট্, খেলা হবে।"

কালো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়, শুয়োরছানাগুলো ওর পায়ের কাছে কুণ্ডলি পাকায়। ও বলে, "হামরাও তো খেল্‌ছি, তুমরা উধারকে খেলো না।"

একটি ছেলে রুখে ওঠে, "দূর, ওধারে খেলব কী ! গোটা মাঠে খেলব।"

কালো গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুয়োরছানারা ওকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

"যাবি না ? তবে রে..." ক'টি ছেলে কালোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে ওকে। মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে যায়। শুয়োরছানাগুলো কাঁইকাঁই করতে করতে আক্রমণকারী ছেলেদের পায়ে হামলে পড়ে। একটি ছেলে একটি ছানাকে বলে শুট করার মতো লাথি মারে। ছানাটা গড়াতে গড়াতে চেঁচাতে থাকে। কালো মার খেয়ে চলে। কোনও কথা বলে না। হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। তিনটে ধাড়ি শুয়োর কোথায় ছিল, ঘোঁতঘোঁত করে ধেয়ে আসে। দেখেই বোঝা যায়, খেপে গিয়েছে, ফুঁসছে। তারা আসছে দেখেই ছেলেগুলি রণে ভঙ্গ দেয়, দুড়দাড়িয়ে ছোটে, পালায়। ক'টি ছেলে আমাদের বাসে এসে ওঠে। ধাড়ি শুয়োররা পলায়মান ছেলেদের তখনও তাড়া করে, মাঠের বাইরে রাস্তাতেও।

বাসে বসেই দেখছি। মাঠে তখনও কালো ঠায় দাঁড়িয়ে, সে হাসছে।

আরে, আরে ! দেখি, বাচ্ছা শুয়োরগুলো দু'তিনটে মিলে মুখ দিয়ে বাতাবিলেবুটাকে কালোর দিকে ঠেলে আনছে।

বাসের সময় হয়ে যায়, বাস ছেড়ে দেয়।

ছবি : প্রবীর সেন

দরজা-জানলা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল

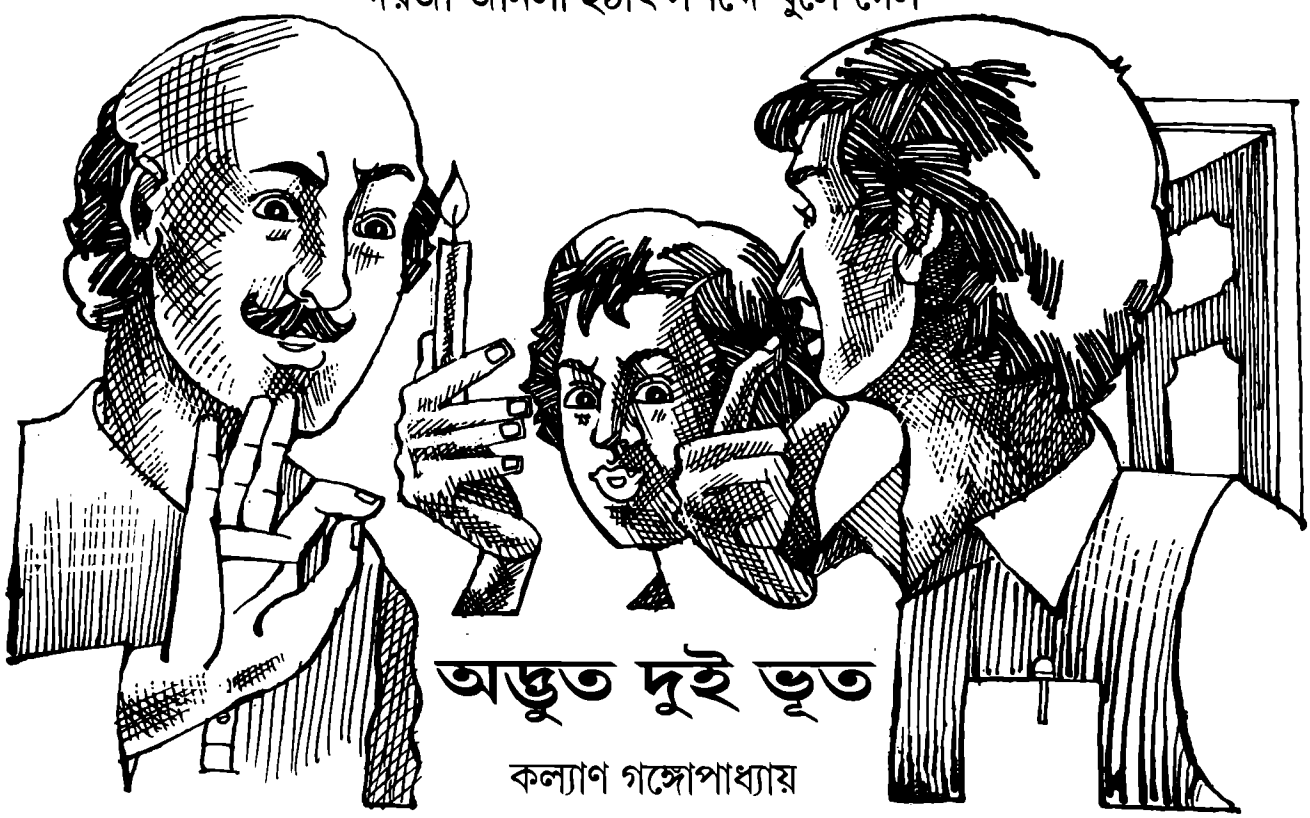

অদ্ভুত দুই ভূত

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

"বললাম তো একটা রাত এ-বাড়িতে থেকে আপনি যদি বেঁচে থাকেন তবে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বাড়িটা আপনাকে ভাড়া দেব।" এই বলে হরনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন। শীতের সন্ধে। ঝপ্ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। হরনাথবাবু বললেন, "সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি একেবারেই এখানে থাকতে চাই না মশাই। চলি। আমি মুকুন্দ মণ্ডলকে পাঠিয়ে দেব। ওঁর খুব ইচ্ছে এই বাড়িটা ভাড়া নেবার। একা থাকতে চান না। যদি আপনার সঙ্গে উনিও একটা রাত এখানে কাটাতে পারেন তাহলে দু'জনেই না হয় মিলেমিশে থাকবেন।" কথাটা বলে হরনাথবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। বাইরের গেটটা খুলে বন্ধ না করেই হনহন করে হেঁটে সোজা রাস্তা ধরে মিলিয়ে গেলেন।

এখানে আসার আগে থানার সেকেণ্ড অফিসার বিশ্বম্ভর বলেছিল, "যদি বলেন তো দুজন কনেস্টবল আপনার সঙ্গে দিতে পারি।" বিশ্বম্ভর আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে আমাকে সাহসী বলে জানে। বললাম, "না, না। আমি একাই থাকব। এখনও একটু গ্রামের দিকে গেলেই এইসব আজগুবি গপ্প-সপ্প শোনা যায়, এই জন্যেই আমরা আর বেশিদূর এগোতে পারলাম না।"

হরনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। ওঁর উলটোদিকে বসে ছিলাম। প্রায় ফাঁকা ট্রেন। আমার কাছে একটা বইও ছিল না যে সময় কাটাব। হরনাথবাবু তাঁর পাশের ভদ্রলোকের কাছে আক্ষেপ করছিলেন, "বাড়িটা কিনে আর বাস করতে পারলাম না, এমনই কপাল।" আমি তাকাতেই প্রায় গায়ে পড়েই জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনিই বলুন তো যখন চাঁদে মানুষ হাঁটছে তখন ভূতফুতগুলোর এখনও এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয়?"

আমি সামান্য হেসে বললাম, "আপনাদের কথাবার্তার কিছুই তো তেমন শুনিনি। সে যাই হোক, আপনি ভূত পেলেন কোথায়?"

হরনাথবাবু তখন বলেছিলেন নতুন-কেনা বাড়িটার কথা। বাড়িটা কিনে জিনিসপত্র নিয়ে প্রথম যেদিন গেলেন সেদিন রাতেই নানা উপদ্রব। ভরসা করে আরও দু'দিন ছিলেন। তিনদিনের দিন সন্ধের আগেই সবাই মিলে পালিয়ে বেঁচেছেন। একটা ঘরে খাট-বিছানাসমেত এখনও কিছু জিনিসপত্র রেখেছেন যদি কোনোদিন সাহস করে সেখানে থাকবার কথা ভাবতে পারেন এই আশায়। সেই রকম সাহস একবার মনে মনে হরনাথবাবুর হয়েছিল। মনের কথাটা বাড়ির লোকের কাছে বলতেই সকলে এমন পালা করে কাঁদতে শুরু করল, তারপর আর হরনাথবাবুর থাকা হয়নি।

আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই এত সুন্দর বাড়িটাতে মুকুন্দ মণ্ডলকে নিয়ে থাকি। মাত্র পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। শহরের ধোঁয়া এড়িয়ে গ্রামের স্বাস্থ্যকর হাওয়া এই বাড়িতে একা আমারই হবে এই রকম ভাবনায় একটা বই খুলে বসলাম।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। মোমের আলো কাঁপছে। বই পড়ার পক্ষে এই আলো যথেষ্ট নয়। ঠাণ্ডাটাও বেশ জোরদার। বিকেলের দিকে হরনাথবাবুর বাড়িতে লুচি, তরকারি আর মিষ্টি খেয়েছি। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার আছে। বড় ফ্লাস্কে গরম কফি। একটা মোম জ্বালালে বইটা ভালভাবে পড়া যাবে, এই ভেবে উঠলাম। হঠাৎ মনে পড়ল হরনাথবাবু যাবার সময় বাইরের গেটটা বন্ধ করে যাননি।

ভেবেছিলাম, মুকুন্দ মণ্ডল এলে তখন বন্ধ করব।

সাড়ে-সাতটা বাজে। শীতের রাত। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। একটানা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। মোমটা জ্বালিয়ে মনে হল বাইরের গেটটা বন্ধ করেই আসি। মুকুন্দ মণ্ডল বোধহয় আর আসবেন না। সত্যি, মানুষের এত ভয়! মনে মনে একচোট হেসে নিলাম।

গেটটা বন্ধ করতে যাব, দেখি অন্ধকারে কালো চাদর জড়িয়ে একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে এসে বলল, "এলাম।"

"আপনি ?"

"আমি মুকুন্দ মণ্ডল। আমার আসার কথা ছিল।"

বললাম, "আসুন।" মনে মনে খানিকটা বিরক্ত হলাম। পরক্ষণেই মনে হল মন্দ কী, বই না পড়ে রাতটা না হয় আড্ডা দিয়ে কাটানো যাবে। গেটটা বন্ধ করতেই মুকুন্দ মণ্ডল বললেন, "আজকের শীতটা কিন্তু খুব বেশি, একেবারে ভিতরে গিয়ে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।"

কিছু একটা নিয়ে কথা চালু করতে হয়, তাই বললাম, "সত্যি আজকে জবর শীত। চলুন ঘরে গিয়ে বসি। দরজা বন্ধ থাকলে শীতবাবাজি খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।"

মুকুন্দ মণ্ডল বললেন, "বেশ।"

"কফি খাবেন নাকি ?"

"না।"

"তাহলে কিছু খাবার। এত খাবার তো আমি একা খাব না, আসুন দু'জনে মিলে খাই।"

মুকুন্দ মণ্ডল খাটে উঠে আমার মুখোমুখি বসে বললেন, "না, না। আমি একটু আগেই খেয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।"

খাবার প্রসঙ্গ ছেড়ে আমি বললাম, "দেখুন মুকুন্দবাবু, আমার কিন্তু ইচ্ছে এই বাড়িতে আমি একাই থাকব। আমার বাড়িতে লোকজন বেশি, সবকটা ঘরই আমার দরকার হবে। তাছাড়া গোটা বাড়িটা নিজের মতো করে পাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা সুখ আছে। কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথাটা আগেই বললাম।"

কথাটা শেষ করতেই মুকুন্দ মণ্ডল দু'হাত তুলে বললেন, "বেশ বেশ, পারলে আপনিই একা থাকুন। আমি আর থাকতে পারব না। নেহাত কথা ছিল আজ আপনার সঙ্গে রাতটা কাটাব, তাই এলাম। কথা রাখতে।"

মুকুন্দ মণ্ডলের কথা শুনে আমার ভদ্রলোককে ভাল লেগে গেল। বললাম, "বাড়িটার কী ব্যাপার বলুন তো। হরনাথবাবু তিন রাত্তির কাটাতে পারলেন না। পালিয়ে গেলেন—কী ব্যাপার ?"

"বাড়িটা ছিল জগমোহন বড়ালের। সাতকুলে থাকবার মধ্যে এক দূর সম্পর্কের ভাইপো। চাকরি-বাকরি নেই, বাউণ্ডুলে, নচ্ছার। কাকার ঘাড়ে বসে খায়। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা মারে। তবু কেন যে জগমোহনবাবু এত সুন্দর বাড়িটা তৈরি করলেন এই ভেবে আমরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনি জগমোহনবাবু ছাদ থেকে তিনটে ফুলের টবসমেত দু'বস্তা ঘুঁটের উপরে পড়ে গেছেন। হাসপাতালে নেবার আগেই শেষ। মাসখানেক যেতে না যেতেই গুণধর ভাইপো হরনাথবাবুর কাছে বাড়িটা জলের দামে বেচে দিল। ভাড়া নেয়ার বদলে হরনাথবাবুর কাছ থেকে বাড়িটা আমার কিনবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যা শুনেছি তাতে আমার পিলে চমকে গেছে।"

"কী শুনেছেন ?"

"এই ধরুন আলো জ্বলছে, হঠাৎ নিবে গেল।" মুকুন্দ মণ্ডলের কথা শেষ হতেই ঘর অন্ধকার।

আমি বললাম, "কী হল ?"

"আলো নিবে গেল।" বলেই মুকুন্দ মণ্ডল খ্যাক-খ্যাক করে হাসলেন। আমি পকেট হাতড়ে লাইটারটা বার করতে যাব তার আগেই মুকুন্দ মণ্ডল বললেন, "আবার ধরুন আলো জ্বলে গেল।" কথাটা শেষ হতেই দেখলাম মোমদুটো জ্বলছে। লাইটার আমার হাতে। বললাম, "এ আবার কী ব্যাপার। আপনি কি জাদু জানেন নাকি ?"

"আমি কেন—আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ জাদু জানে না। এই বাড়িটার ধরন-ধারণটাই অদ্ভুত। এই দেখুন না, হরনাথবাবুর আলমারিটা—আপনার কি মনে হয় জ্যান্ত ?"

"আলমারি আবার জ্যান্ত হবে কি !"

"কিন্তু দেখুন কেমন হাঁটছে।"

আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া। আলমারিটা সামান্য শব্দ করে ঘরের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বাচ্চা ছেলের মতো থপথপিয়ে হাঁটল। তারপর আবার জাগায়ামতো গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি মুকুন্দ মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাব তার আগেই মুকুন্দ মণ্ডল বললেন, "জীবনে কখনও শুনেছেন মশাই যে খাট গিয়ে ছাদে ঠেকে।"

কথাটা শেষ হতেই দেখি খাটটা আমাদের দুজনকে নিয়ে একটু-একটু করে ওপরের দিকে উঠছে। নীচে মোমের আলো। ছাদে খাটের ছায়াটা একটু-একটু করে প্রকাণ্ড হচ্ছে। আবছায়ার মধ্যে দেখি মুকুন্দ মণ্ডলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। আমার চাঁদি ঠেকে আছে ছাদে। খাটটা আরও উঠতে থাকলে আমি চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাব। তাকিয়ে দেখি মুকুন্দ মণ্ডলের মাথা থেকে ছাদ প্রায় হাত-খানেক দূরে। বাচ্চাছেলের মতো ছোট দেখাচ্ছে মুকুন্দ মণ্ডলকে। সেদিকে তাকিয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

"ধরুন দরজা-জানলা খুলে গেল, আর খোলা দরজা দিয়ে খাটটা সাঁ করে ছুটে গিয়ে আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল হাওয়া খাওয়াতে। হতে পারে না ?"

আমি মুকুন্দ মণ্ডলের কথায় আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, "না।"

"অবিশ্বাস করাটা আপনাদের অভ্যাস মশাই।" মুকুন্দ মণ্ডলের কথার মধ্যেই খাটটা যথাস্থানে নেমে এল। আমি বোধহয় ভুল দেখেছিলাম, মুকুন্দ মণ্ডলের আকার ঠিকই আছে। বললেন, "ওই দেখুন।"

কথাটা শেষ হতেই দরজা-জানলা সশব্দে খুলে গেল। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। কোনোরকমে বললাম, "দরজাটা আপনি গিয়ে বন্ধ করে আসুন।"

মুকুন্দ মণ্ডল বললেন, "আমাকে এই অনুরোধটা করবেন না দাদা। আমার দ্বারা হবে না।" কথাটা শেষ হতেই দরজা দিয়ে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

বললাম, "আপনি কে ?"

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছিলাম। দরজা খোলা দেখে ভাবলাম ঘরে বোধহয় একটু গরম হবে।" এই বলে একটা চেয়ার টেনে বললেন, "বাহ্! ঘরের ভিতরটায় দেখছি একেবারে ফুলের গন্ধে ম-ম করছে।"

সত্যিই ঘরের ভিতরে ফুলের গন্ধ। এত সুন্দর গন্ধ কোনো বিশাল ফুলের বাগানে গিয়েও পাইনি কখনও। কোনো কথা বলতে পারলাম না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, "মুকুন্দ, তোমাকে এখানে দেখতে পেয়ে আমার খুব ভাল লাগছে।" পরক্ষণেই বললেন, "এ কী! চেয়ারটা নড়ছে কেন? কী আশ্চর্য! আমাকে নিয়ে সমস্ত ঘর ঘুরবে নাকি চেয়ারটা!" কথাটা শেষ হতেই দেখলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোক চেয়ারে গুটিশুটি মেরে বসে আছেন, আর চেয়ারটা তাঁকে নিয়ে ঘুরছে সমস্ত ঘর।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন মজা পেয়েছেন। বললেন, "বাহ্! বেড়ে মজা তো—আলমারি চলবে, খাট উঠবে, দরজা খুলবে। ফুলের গন্ধ মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ঘুঁটের বস্তা। আরে, মুকুন্দ, ঘুঁটের এমন বিদঘুটে গন্ধ হয় আমার তো জানা ছিল না।"

উৎকট গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। দেখলাম ঘরের মধ্যে দু'বস্তা ঘুঁটে। আলমারি, চেয়ার—সব নড়ছে। খাটটা উঠছে ওপরের দিকে। আমার মাথা প্রায় ছাদ ছুঁই-ছুঁই। তারপরে আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ মেলে তাকালাম, তখন সামনে অনেক অপরিচিত মানুষের মুখ। তার মধ্যে হরনাথবাবু। আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, "কেমন আছেন?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "মুকুন্দ মণ্ডল কই!"

হরনাথবাবু অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, "এই কথাটা বলাবার জন্যেই তো এত সকালে আসা। গতকাল মুকুন্দর বাড়িতে গিয়ে দেখি ওর বাড়িতে কান্নাকাটি। মুকুন্দ মারা গেছে সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তখনই আপনাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে আসার সাহস ছিল না।"

"সে কী! কাল তো মুকুন্দ মণ্ডল আমার সঙ্গে ছিলেন।"

যারা এসেছিল তারা আমার কথা শুনে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। হরনাথবাবু বললেন, "আপনার শরীর খারাপ লাগলে শুয়ে থাকুন। মুকুন্দ আসবে কীভাবে! ওকে পোড়ানো হয়েছে কাল রাতেই।"

আমি উঠে বসলাম। বললাম, "আরও একজন ছিলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি কোথায়?"

"বৃদ্ধ ভদ্রলোক! কেমন দেখতে?" হরনাথবাবুর চোখ গোল হয়ে এল।

বললাম, "মাথায় টাক। সাদা বিশাল এক জোড়া গোঁফ।"

"কী সর্বনাশ! আপনি দেখেছেন! উনিই তো জগমোহন বড়াল। আপনার আয়ুর জোর আছে মশাই! এর পরেও আপনি বেঁচে আছেন! মুকুন্দর বাড়ির লোক বলছিল, মুকুন্দ মরবার আগে চিৎকার করে বলেছে—জগমোহনবাবু, আমায় ছেড়ে দিন। ও বাড়িতে আমি যাব না।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ।

জেনে নাও

শীত পেলে শরীর কাঁপে কেন

গ্রীষ্মকালে গরম আর শীতকালে শীত লাগে। আমরা যে শীত বুঝতে পারি তার জন্যে দায়ী আমাদের দেহের চামড়ার ভেতরে একটা গ্রাহকযন্ত্র। এই গ্রাহকযন্ত্র শীতের খবরটা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অঞ্চলে। তাতে শীত-কম্পন কেন্দ্র আছে। মস্তিষ্কে শীতের খবর এলে এই কেন্দ্রটা সক্রিয় হয়। খুব বেশি শীত করলে এই কেন্দ্রটা এমন সক্রিয় হয় যে, এর ফলে আমাদের দেহের কয়েকটি পেশী কাঁপতে থাকে। আর এই কাঁপনের ফলে তাপ বেরিয়ে আসে। সেই তাপ শরীরের সঠিক তাপটা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আঘাত লাগলে ফোলে কেন

মাথা বা পা বা শরীরের যে-কোনো জায়গা হোক, আঘাত লাগলে ফুলে যায়। কেন?

যখন শরীরের বাইরের দিকের কোনো অংশে হঠাৎ আঘাত লাগে, তখন একই সঙ্গে কয়েকটা কাজ চলতে শুরু করে। এ যেন একই সুতোয় বাঁধা কটা ঘন্টার মতো—সুতোর একটা দিক ধরে টানলে সব কটাই বেজে উঠবে।

যেই আঘাত লাগে অমনি কী হয়?

আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক শিরা-উপশিরা গেছে। যেই কোনো জায়গায় আঘাত লাগে, অমনি সেই জায়গার শিরা-উপশিরায় রক্ত-সঞ্চালন সাময়িকভাবে বাধা পায়। বাধা পেলে ওই জায়গাটা অনেকটা হাওয়া-বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। তা ছাড়া ওই আঘাতের জন্যে কিছু শিরা-উপশিরা ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে রক্ত রক্তনালী থেকে ওই জায়গায় বেরিয়ে আসে। সঙ্গে রক্তরস (Plasma) থাকতেও পারে বা না পারে।

কিন্তু রক্ত যখন নালী থেকে বাইরে আসে তখন হিস্টামিন নামে একটা সাদা কেলাসিত পদার্থ আর কয়েকটি উপাদান আঘাত লাগা জায়গাটির আশপাশ থেকে রক্তরসের প্রবাহ ওই জায়গায় বাড়িয়ে তোলে। সব মিলে জায়গাটি সাময়িকভাবে ফুলে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে ওই রস আবার নতুন রক্তনালীর মাধ্যমে শরীরের অন্য অংশে শোষিত হলে ফোলা কমে যায়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আড়িয়াদহ কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ অঞ্চলের সবচেয়ে নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আড়িয়াদহ কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৮৪ সালের ৬ জানুয়ারি। গত বছর এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে।

স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী শশিপদ গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী, নৃত্যগোপাল ঘোষাল ও বিহারীলাল ঘোষের উদ্যোগে যখন এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন নাম ছিল নর্থ সুবার্বন অ্যাকাডেমি। ১৮৮৪ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত স্কুলের নিজস্ব কোনও বাড়ি ছিল না, আর্থিক অবস্থাও ছিল খারাপ। শশিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় স্কুলের কাজকর্ম চলত (১৮৮৪-১৮৯০)। আড়িয়াদহ গ্রামের প্রথম এম. এ. বিহারীলাল ঘোষ ছিলেন এই স্কুলের প্রথম প্রধানশিক্ষক। তৎকালীন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে এই স্কুলের কাজকর্ম দেখতে এসেছিলেন। 'ভিজিটর্স বুক'-এ তাঁর লেখা মন্তব্য থেকে জানা যায়, স্কুলে তখন ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২২৫। ছাত্রদের বসবার জন্য কোনও বেঞ্চি ছিল না, তারা মাদুরে বসত, বই রাখত কেরোসিনের প্যাকিং বাক্সের উপর।

১৯০৬ সালে আড়িয়াদহ গ্রামের কৃতী সন্তান রেঙ্গুনপ্রবাসী শিবপদ দাসের দানে স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়। সেই সময় নর্থ সুবার্বন অ্যাকাডেমি নাম পালটে শিবপদবাবুর ইচ্ছানুসারে স্কুলের নাম রাখা হয় কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়।

এই স্কুলের অসংখ্য ছাত্র জীবনের নানা ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম : অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অধ্যক্ষ হৃষীকেশ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দ, ডাঃ কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক পরিমল চট্টোপাধ্যায় (বাত্যায়নিক), সাংবাদিক বিনয় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিবনাথ ভট্টাচার্য, ক্রিকেটার বরুণ বর্মন, সমাজসেবী অজয় ঘোষাল ও শান্তিরঞ্জন ঘটক।

স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১১৭৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১২০ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ১৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৬ জন, তৃতীয় বিভাগে ২১ জন। স্টার পেয়েছে ৩ জন। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এই রকম : (১৯৮২) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৬, প্রথম বিভাগ ৮, দ্বিতীয় বিভাগ ৩৩, তৃতীয় বিভাগ ২৯। (১৯৮৩) পরীক্ষার্থী ১০১, প্রথম বিভাগ ৯, দ্বিতীয় বিভাগ ৪৫, তৃতীয় বিভাগ ১৩। স্টার ৩ জন। ১৯৮৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুলের ছাত্র অমিত দত্ত ১০ম স্থান অধিকার করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রঞ্জন বসু পেয়েছে ২০শ স্থান। ১৯৭১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯ম স্থান অধিকার করেছিল সুমিত নাগ। ১৯৭৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে ৩য় হয়েছিল আনন্দমোহন পাল। স্কুলের বহু ছাত্র জাতীয় মেধাবৃত্তি পেয়েছে।

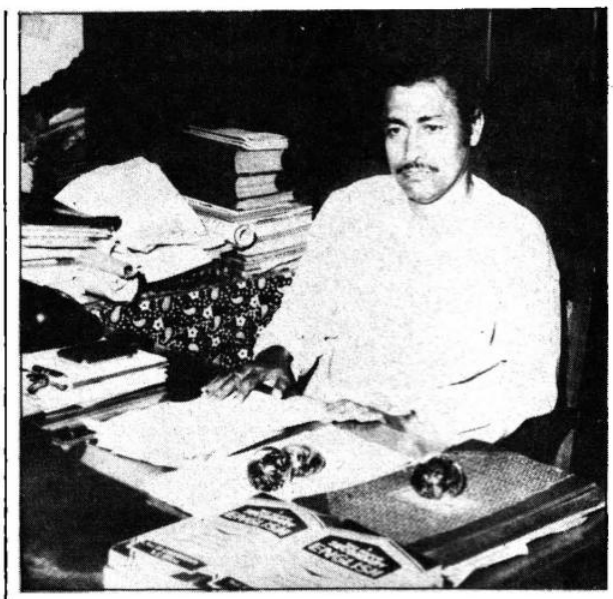

বর্তমান প্রধানশিক্ষক ক্ষেত্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজির এম-এ। ১৯৭০ সালে এই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন, ১৯৭৭-এ হন প্রধানশিক্ষক। এর আগে তিনি মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় ও বীরপাড়া হাইস্কুলে (জলপাইগুড়ি) শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রায় তিন দশকের। কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক জানালেন, **"পরীক্ষায় ভাল ফল নিছক কথার কথা নয়, এর জন্য সারা বছর ধরে তৈরি হতে হয়। পরীক্ষা মানেই কঠিন সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে জয়ী হতে হলে কেবল পড়াশোনাই নয়, নিরলস সাধনার দরকার। ক্লাসের বই তন্ন-তন্ন করে পড়তে হবে। পড়তে হবে রেফারেন্স বইও। কিন্তু রেফারেন্স নির্বাচনের সময় সতর্ক থাকতে হবে।** দরকার হলে মাস্টারমশাইদের সাহায্যও নিতে হবে। কারণ বিস্তর হাবিজাবি বইয়ে বাজার ছেয়ে আছে। টেস্টপেপার্স থেকে প্রশ্ন-উত্তর অনুশীলন করতে হবে। নিয়মিত। আর ক্লাস-ফাঁকির মনোভাবও ত্যাগ করতে হবে। অকারণ নানা ছল-ছুতোয় ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কামাই করে। এটা ঠিক নয়। ভাল হাতের লেখা, ভাষার উপর ভাল দখল, প্রশ্ন যেমনই হোক তার ভাল উত্তর লেখা—পরীক্ষায় ভাল করতে সাহায্য করে।"

নোটবইয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই ক্ষেত্রভূষণবাবু বললেন, "নোটবই অপরিহার্য না হলেও দরকার। মাঝে-মাঝে

নোটবইও দেখতে হয় বইকী। ছাত্রছাত্রীদের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, মাস্টারমশাইরাও সর্বদা তাঁদের বিদ্যেবুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তাঁদেরও নোটবই দেখে ক্লাসে আসতে হয়। আমার বিবেচনায় 'ভাল নোটবই' ছাত্রদের গাইড হিসেবে কাজ করে।"

বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও কর্মশিক্ষা—এই সাতটি বিষয় সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক ক্ষেত্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় যা বললেন, তা হল এই :

"বাংলা যদিও মাতৃভাষা, কিন্তু দুরূহ বিষয়। যেন তেন প্রকারেণ পাশ করার বিষয় নয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে না। গুছিয়ে একটা চিঠি লিখতে পারে না। বাংলায় দরখাস্ত লিখতে বললে গায়ে জ্বর এসে যায়, বারো লাইনে বাহান্নটা ভুল বেরিয়ে পড়ে। বাংলা যারা মন দিয়ে পড়ে, তারা ভাল নম্বর তুলবে—এতে কোনও সন্দেহ নেই। **বিস্তর ছেলেমেয়ে সাহিত্য অংশের চমৎকার উত্তর লেখে, কিন্তু যত বিভ্রাট বাধায় ব্যাকরণ অংশে।** ব্যাকরণে ভূরি-ভূরি ভুল বের হয়। অথচ মজার কথা, ব্যাকরণেই ওঠে সবচেয়ে ভাল নম্বর। কাজেই **বাংলা ব্যাকরণকে কোনওভাবেই অবহেলা নয়।** ভাষায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

"ইংরেজি বিষয়টিকে ভয় পায় না, এমন ছেলেমেয়ে কম। কিন্তু কেন? আমি অনেক ভেবেও কারণ খুঁজে পাইনি। **ইংরেজিতে** ফাঁকি দেবার কোনও সুযোগ নেই। **পাঠ্যাংশ খুঁটিয়ে পড়তে হবে, গ্রামার ট্রানস্লেশনের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ইংরেজি সংবাদপত্র, বিদেশী লেখকদের বইপত্র পড়তে পারলে উপকার হবে।** ভাষার উপর দখল আসবে। ভয়ও আস্তে আস্তে কাটবে।

"অঙ্ক বিষয়টিও অনেকের কাছে রীতিমত ভয়ের। নিয়মিত অনুশীলন তো দূরের কথা, সারা বছর অঙ্ক বইয়ের পাতা ওল্টায় না এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম নয়। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য তারা মুখস্থ করে অঙ্ক আর জ্যামিতি। এগুলো অতি বাজে অভ্যাস। অঙ্কের মতো এত চমৎকার বিষয় আর কিছু নেই। **অনুশীলন ছাড়া অঙ্কে ভাল নম্বর তোলবার অন্য কোনও রাস্তা নেই।**

"ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ছেলেমেয়ের মনেই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। ইতিহাস ভালভাবে পড়ে না, ভুলভাল উত্তর লেখে। তার ফলও হয় মারাত্মক। **ইতিহাস বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে, একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েই পড়া উচিত।** অনেকে প্রশ্ন বেছে বেছে পড়ে—এটা ঠিক নয়।

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূগোল পড়তে হবে। ভূগোল বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। **ভূগোল ভালভাবে পড়া থাকলে ইতিহাস বুঝতে সুবিধে হয়।** উচ্চতর লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। ভূগোলের সবচেয়ে বড় কথা : মানচিত্র। এই মানচিত্র আঁকার ব্যাপারটা ভালভাবে রপ্ত করতে হবে।

"বিজ্ঞান বিষয়টি অনেকে মুখস্থ করে। বিজ্ঞান মাথা পরিষ্কার করে বোঝার বিষয়, মুখস্থ করে কিছু লাভ হয় না। পাঠ্যবই আগাগোড়া পড়তে হবে, এলোমেলো ভাবে পড়লে চলবে না। উত্তরও হওয়া চাই প্রশ্নানুগ। ছবি এঁকে উত্তর দিতে পারলে সুন্দর নম্বর উঠবে।

"কর্মশিক্ষা ছাত্রদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। এই বিষয়টিতে কোনও একঘেয়েমি নেই, সজীবতা আছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, কোনও ছাত্র যদি অন্য বিষয়ের ক্লাসে ফাঁকি দেয়ও, কর্মশিক্ষার ক্লাসে সে হাজির হবেই।"

সবশেষে, 'আনন্দমেলা' সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আনন্দমেলা ছোটদের প্রয়োজনীয় পত্রিকা। কিশোরমনের উপযোগী সব উপকরণই এই পত্রিকাতে আছে।"

শ্যামলকান্ত দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

আড়িয়াদহ কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে তপনকুমার রায়চৌধুরী। প্রথম থেকেই এই স্কুলে পড়ছে তপন। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে তপন পেয়েছে ৫৬৮। ওর কথায়, "ফল ভাল হয়নি। মাধ্যমিকে যাতে ভাল করতে পারি সেজন্য এখন থেকেই চেষ্টা করছি।"

তপন থাকে দক্ষিণেশ্বরে। তপনের বাবা শ্রীশম্ভুনাথ রায়চৌধুরী, মা শ্রীমতী বন্দনা রায়চৌধুরী। বাবা তপনকে মাঝে-মাঝে ইংরেজি দেখিয়ে দেন। দু'জন গৃহশিক্ষক আছেন। একজন ইংরেজি পড়ান, অন্যজন বিজ্ঞান। তাপস দিনে সাত-আট ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিনে ক্লাসের বইপত্র পড়ে না, গল্পের বই পড়ে

আর খেলাধুলো করে সময় কাটায়।

বাংলায় পি আচার্য, বি চৌধুরী ও বামনদেব চক্রবর্তীর বই পড়ে তপন। ইংরেজিতে পড়ে চক্রবর্তী-সেনের বই। ইতিহাসে কিরণ চৌধুরী ও প্রভাতাংশু মাইতির বই। ভূগোল : বসু-ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অঙ্ক : কেশবচন্দ্র নাগ। ভৌতবিজ্ঞান : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর গুহ, সুখেন্দু মাইতি, অজয় চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, অলোক চক্রবর্তী। জীবনবিজ্ঞান : সান্যাল-চ্যাটার্জি, অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, কাজল চক্রবর্তীর বই। অতিরিক্ত বিষয় পদার্থবিদ্যা, তপন পড়ে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের বই।

ভবিষ্যতে একজন বড় ডাক্তার হতে চায় তপন। অবসর সময়ে পড়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা আর মনীষীদের জীবনী। তপন ফুটবল খেলে, ক্রিকেটও খেলতে খুব ভালবাসে। প্রিয় ফুটবলার : কৃশানু দে। প্রিয় ক্রিকেটার : কপিলদেব।

"আনন্দমেলা' তপনের প্রিয় পত্রিকা। 'লেখাপড়া' বিভাগ থেকে খুব সাহায্য পায়।

ধাঁধা

বেচারি তীর্থ। দৌড়ে নতুন রেকর্ড করবে বলে আমরা যখন সাগ্রহে অপেক্ষা করছি, চোখ রাখছি কাগজের পৃষ্ঠায়, তখনই দুঃখের খবরটা এল। কুকুরের দৌরাত্ম্যে তার দৌড় নাকি মধ্যপথেই পরিত্যক্ত। পরে আবার ব্যবস্থা হবে। লবণ হ্রদ স্টেডিয়ামে।

তীর্থের দৌড়ের খবরে উৎসাহিত হয়ে কি না জানি না, আমাদের পাড়ায় দেখছি নতুন একটা চাঞ্চল্য জেগেছে। কখনও হচ্ছে '২৪ ঘণ্টার অবিশ্রাম দৌড়', কখনও বা আরও বেশি সময় ধরে। আর আজকাল সব হুজুগেই যা হয়, সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে অবিরাম লাউডস্পিকারে গান বাজানো। গান থামিয়ে মাঝে-মাঝে ঘোষকের গলা। সে-গলাতেও আবার বেতার-ভাষ্যকারদের প্রভাব। বিশেষত যাঁরা খেলার রিলে করেন কিংবা যাঁরা খবর পড়েন, তাঁদের।

তা, এইসব কাণ্ডকারখানার জন্যই কি না কে জানে, ছোট্কাও দেখছি এবারের নতুন ধাঁধাটা দিল দুজন দৌড়বীরকে নিয়ে। শুনতে বেশ সোজা। অঙ্কটা একটু খটমট যদিও। উত্তরটা তোমরাই করবে, কেননা আমার উত্তর হয়ে গেছে। এবং অনেকদিন বাদে, ঠিক-ঠিক মিলেছে। এবার তাহলে ধাঁধাটা বলি ?

প্রথম ধাঁধা ॥ দুজন দৌড়বীর। ধরা যাক, একজনের নাম ক। অন্যজন খ।

ক এক মাইল দৌড়য় ৪·১২ মিনিটে। খ ১ ঘণ্টায় দৌড়য় ৪·১২ মাইল।

এখন ভেবেচিন্তে বলো তো, দুজনের মধ্যে কার দৌড়ের গতিবেগ বেশি ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পরবর্তী সংখ্যাটা কত হবে ?

২, ৭, ১৭, ৩৭, ৭৭, ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কী সেই বস্তু যা আলোর তৈরি, কিন্তু তবু কালো ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ২৪ ঘণ্টায় ৩০০ বার বাজবে ঘণ্টা। (২) ৭২৯। (৩) কপিঞ্জল। বাকি সব চতুষ্পদ, একটিই দ্বিপদ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

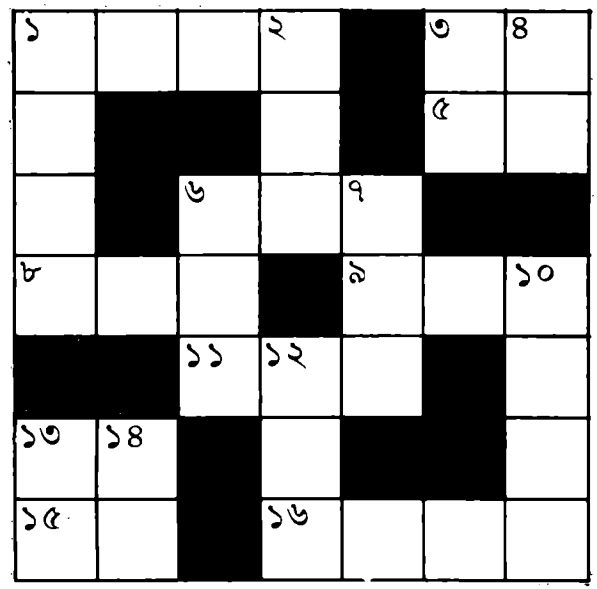

সংকেত : পাশাপাশি : (১) নক্ষত্রবিশেষ। (৩) ক্ষুদ্র। (৫) দাম। (৬) গতিশীল। (৮) মাছবিশেষ (৯) সম্পূর্ণ নীরব। (১১) সম্মানসূচক সম্বোধন। (১৩) বালি ও ক্ষার থেকে যে-বস্তু তৈরি হয়। (১৫) ইন্দ্র (১৬) প্রহ্লাদের দুই দুর্বৃত্ত শিক্ষক।

উপর-নীচ : (১) পুতুল। (২) পাহাড় বা মাটি কেটে যে-পথ বার করা হয়। (৩) নয় নদী নয় খাল, কাস্পিয়ান বৈকাল। (৪) ব্যাকরণে বর্ণ। (৬) জলে জাত। (৭) প্রভু। (১০) পূজায় দেবতাকে নিবেদন করা হয় যে পাঁচমিশেলি বস্তু। (১২) অভিযোগ। (১৩) দীর্ঘ তৃণবিশেষ। (১৪) চাকা।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

চি	ত্র	ক	■	ক	ল	মা
রু	■	■	জ	■	■	ত
নি	ম	■	ন	■	ধূ	লি
■	স	র	গ	র	ম	■
কা	ন	■	ণ	■	কে	কা
সু	দ	■	ম	■	তু	লি
ন্দি	■	দো	ন	লা	■	ন্দী

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই চারটে সমান মাপের টুথপিক কিংবা চারটে ব্যবহার-করা দেশলাইকাঠি। কাঠি চারটে নিয়ে টেবিলের ওপর নীচের ছবির মতো সাজাও—

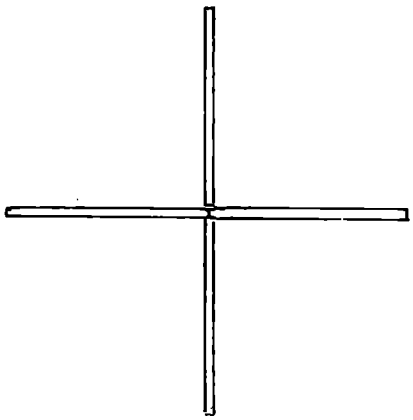

সাজিয়েছ ? বেশ। এবার বন্ধুদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দাও। তাদের বলো, এর মধ্য থেকে মাত্র একটা কাঠি সরিয়ে ফের এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে কিনা একটা SQUARE তৈরি হয়। হ্যাঁ, মনে রেখো যে, বলার সময় কিন্তু 'স্কোয়ার' কথাটাই তুমি বলবে। ভুলেও বর্গক্ষেত্র বলে ফেলো না। এবার দ্যাখো, কী ফাঁপরেই না পড়বে বন্ধুরা। ভেবেই কূল পাবে না যে, কীভাবে কী করবে, কোন্ কাঠিটা সরিয়ে ফের বসাবে। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ।

এবার তুমি তাহলে সমাধানটা দেখিয়ে দাও। সে কী, তোমারও হয়নি ? কী লজ্জা ! সত্যি যদি না হয়ে থাকে, তবে লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য দেখে নাও নীচের সমাধানটা—

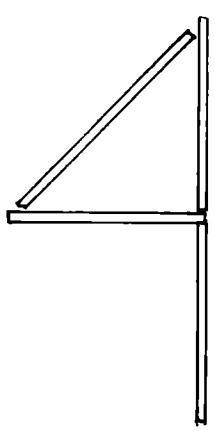

'চার' মানে যে SQUARE, সন্দেহ আছে তাতে ?

মজারু

হাসিখুশি

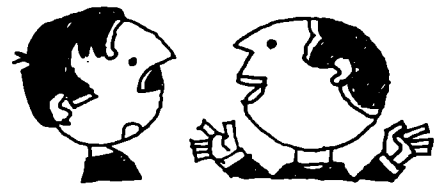

"তারা কি জানে আমি কবিতা লিখি ?"

"না, তুমি মিথ্যে কথা বলো আর ঘুম থেকে ওঠো দেরি করে—এটুকুই তাদের বলেছি। এখনই তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানানো ঠিক নয়।"

ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন মাস্টারমশাই : স্যার আইজাক নিউটন বসে ছিলেন গাছের নীচে। গাছ থেকে একটি আপেল পড়তে দেখেই তিনি আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

পেছনের বেঞ্চ থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর : স্যার, কাল থেকে আমরা কি গাছের তলায় বসব ?

"জলচর প্রাণী কাদের বলে পাপান ?"

"যারা জলে বাস করে।"

"একটা উদাহরণ দিতে পারো ?"

"পারি স্যার। নৌকো।"

রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে গিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, "কাটলেট এত শক্ত যে, খাওয়া যাচ্ছে না।"

ম্যানেজার ডাকলেন রাঁধুনিকে। সে বলল, "এ তো হতেই পারে না। কুড়ি বছর ধরে আমি এখানে খাবার বানাচ্ছি।"

ভদ্রলোক তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "কিন্তু কুড়ি বছর আগেকার খাবারটাই যে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সে খেয়াল আছে ?"

বড়দিনের কেক টুকরো-টুকরো করে কাটছিলেন মা। ছোট্ট তাতান তাই দেখছিল। এক সময় সে বলে উঠল "টুকরোগুলো আরও ছোট করে কাটলে তো বেশি হয় মা। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।"

বাবা : দ্যাখো পাপান, তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন ডাক্তার, আমিও ডাক্তার। তুমি কী হতে চাও ?

পাপান : উকিল। রুগিদের হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে চাই।

"শুনলাম, তুমি নাকি তোমার পাওনাদাররা বাড়িতে টাকা চাইতে এলে কামড়ে দাও ?"

"আমি কামড়াব কেন ? ওটা তো আমার কুকুরটাই করে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

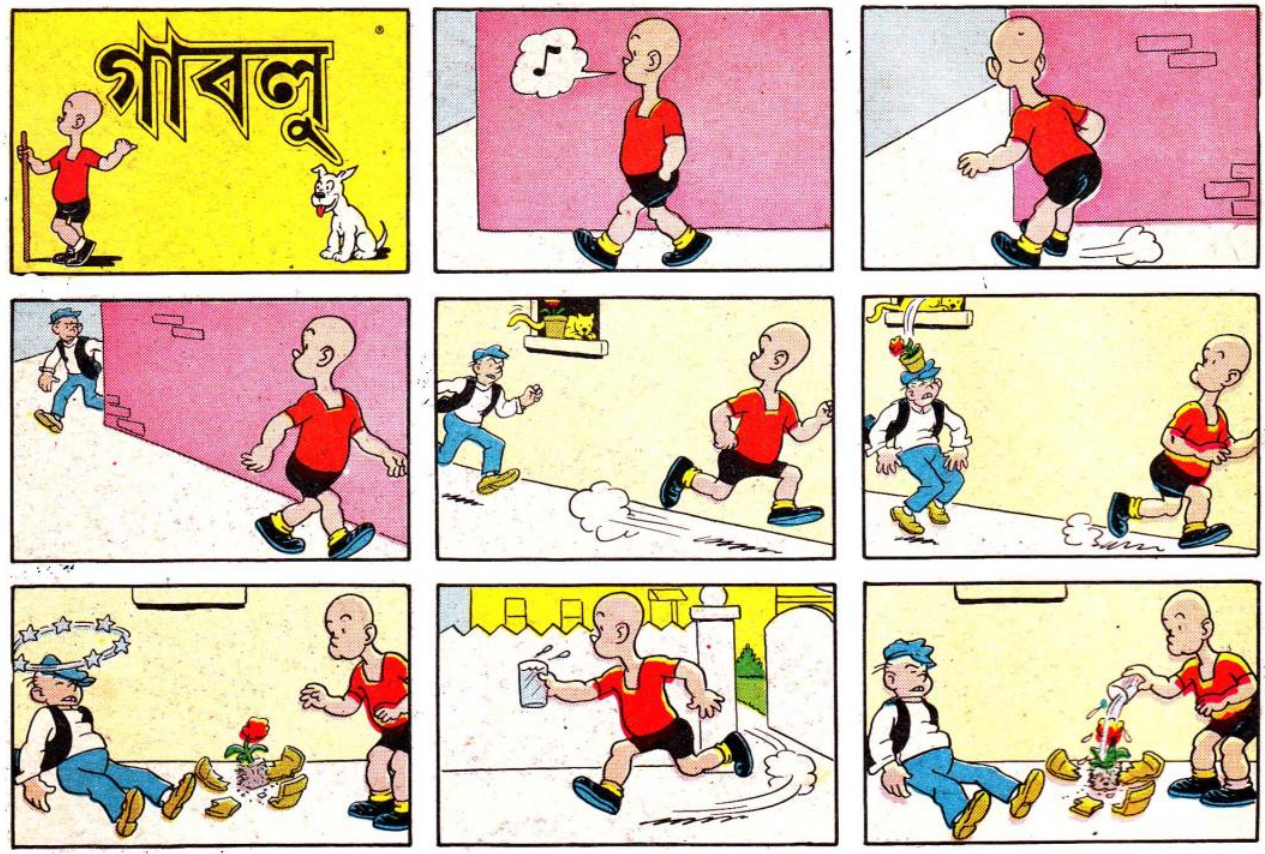
গাবলু

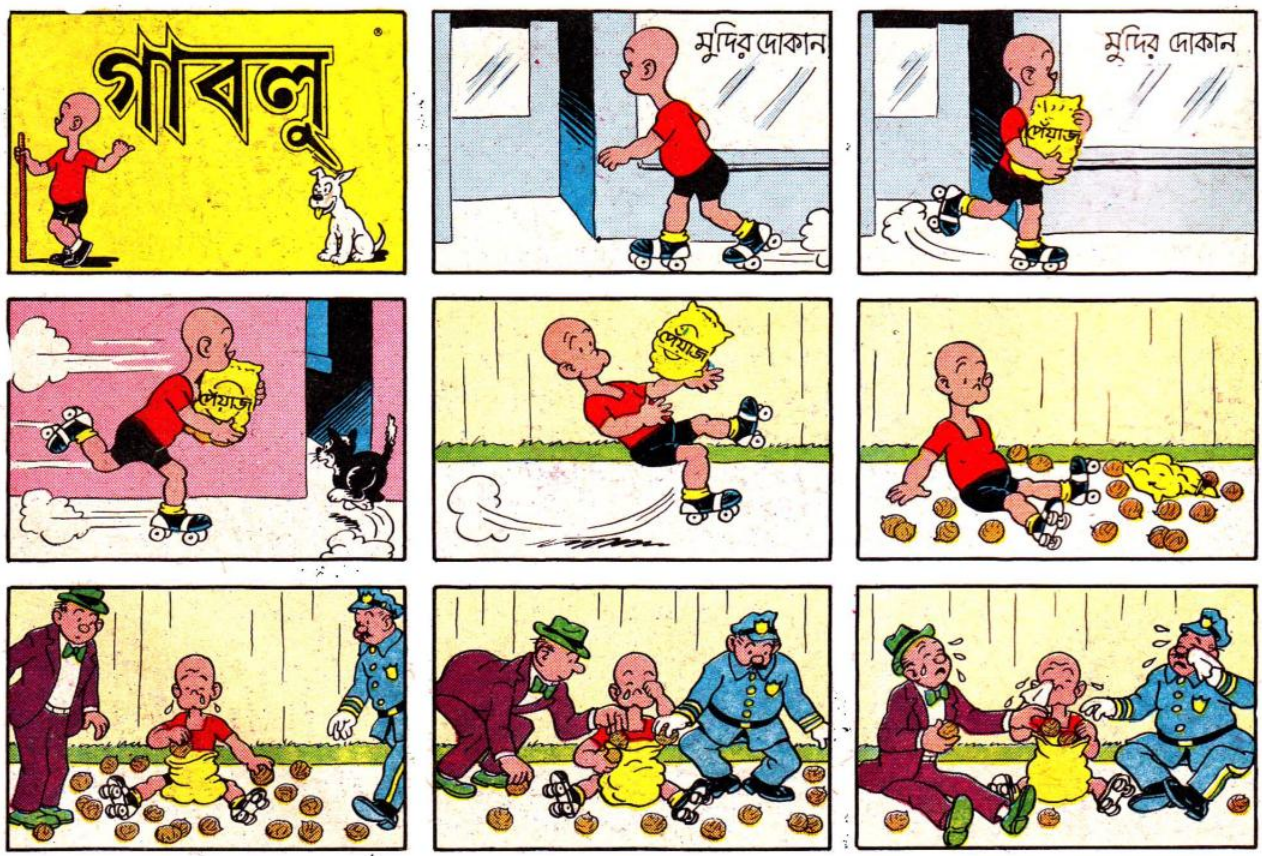
গাবলু
মুদির দোকান
মুদির দোকান
পেঁয়াজ
পেঁয়াজ
পেঁয়াজ

লয়েড গেলেন, ভিভ এলেন

রাজা গুপ্ত

এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহই নেই যে, দীর্ঘ দশ বছর ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটকে আগলে রেখেছিলেন ক্লাইভ লয়েড। সেই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, ১৯৮১র ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৪র ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা ২৭টি টেস্টে অপরাজিত থাকার অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের পেছনে তাঁর 'মস্তিষ্ক' এবং ব্যাটের বিক্রম দুটিই সমভাবে সক্রিয় ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমে সুপার-স্টারের অভাব ছিল না কোনওকালেই। লয়েডের আমলেও হয়নি। রিচার্ডস, গ্রিনিজ, কালিচরণ, রো, রবার্টস, হোল্ডিং, ক্রফট, গারনার, মার্শালদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সেরা।

লয়েডের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, সীমাহীন গাম্ভীর্য দলের মধ্যে বেচাল কিছু ঘটার সুযোগ দেয়নি কখনও। ক্রিকেটারদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ কিংবা ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে কখনও ভুগতে হয়নি ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই নয়, ক্রিকেট-ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার অধিনায়কত্ব করার বিশ্ব-রেকর্ড, সাত হাজার রান, শতাধিক টেস্ট খেলার কৃতিত্ব, একটানা এগারোটি টেস্ট জয়ের বিশ্ব-রেকর্ড এবং দু-দুবার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার গৌরব নিয়ে সরে দাঁড়ালেন লয়েড। সামনের নিউজিল্যাণ্ড সফরে প্রত্যাশামতোই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাল ধরবেন ভিভ রিচার্ডস।

আইজ্যাক ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার রিচার্ডস নামের ব্যাটসম্যানটি ব্যাট হাতে পৃথিবীর অধিকাংশ বোলারদেরই উদ্বেগের কারণ হয়েছেন। এটা ধরেই নেওয়া হয়, উইকেটে দীর্ঘ সময় রাজত্ব করা এবং বোলার নামক অসহায় জীবটির ওপর যথেচ্ছ প্রভুত্ব করার জন্যেই তিনি ক্রিজে আসেন। সারা পৃথিবীতে এমন পপুলার ক্রিকেটার আর দুটি নেই। ভিভ যেদিন ফর্মে সেদিন তিনি পৃথিবীর সম্রাট। দুনিয়ার সেরা বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধেও কেয়ার-ফ্রি নীতি তাঁর ভয়ংকর-সুন্দর ব্যাটিংয়ের মূল কথা। অবশ্য আক্রমণে দর্শনধারী হতে গিয়ে রিচার্ডস নিজের বিপদ ডেকে

ভিভিয়ান রিচার্ডস (নতুন অধিনায়ক)

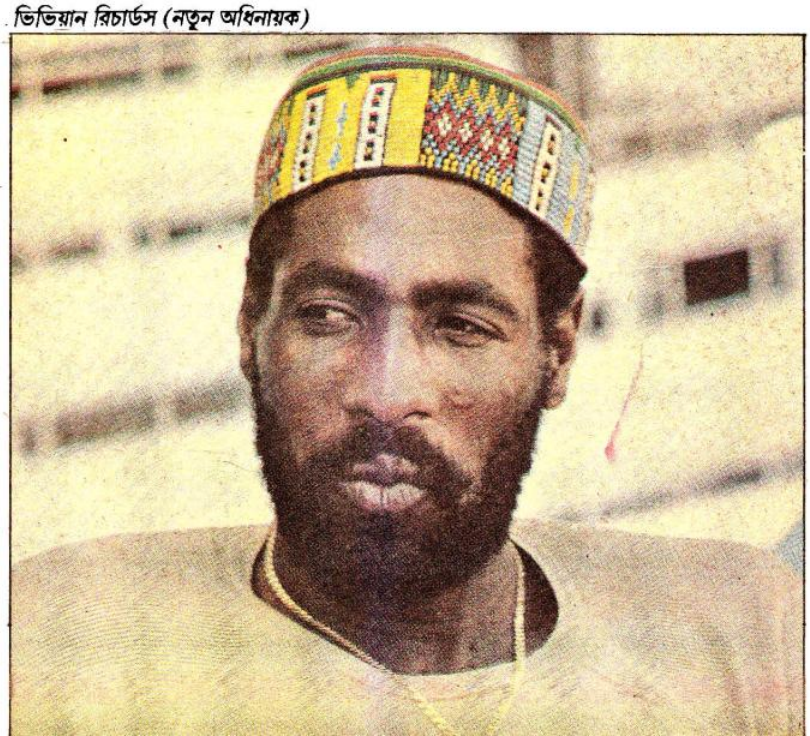

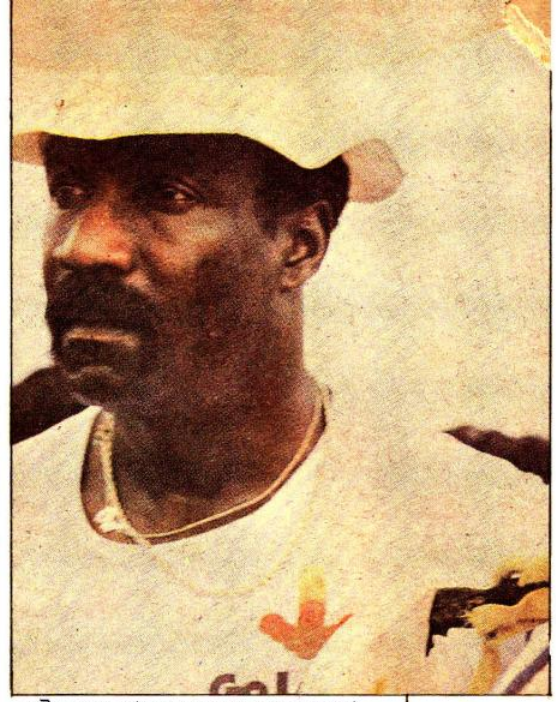

ক্লাইভ লয়েড (এক দশকের সফল নেতৃত্ব)

এনেছেন বহুবার। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বলও অন-সাইডে খেলার প্রবণতা দেখে বিশেষজ্ঞরা ভুরু কুঁচকেছেন, এবং বলেছেন "আন-সায়েনটিফিক।" অনেকেই বুঝতে চাননি ক্রিকেট-ব্যাকরণে আবদ্ধ থাকার কাজটি রিচার্ডসদের মতো প্রতিভাবানদের জন্যে নয়। সুতরাং আন-অর্থোডক্স ক্রিকেটের পথ ধরেই চলেছে তাঁর রাজকীয় বিচরণ।

এর আগে লয়েডের অনুপস্থিতিতে বারদুয়েক ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভিভ। প্রথমবার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালে। দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৮৪ সালে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রিচার্ডসের ব্যাটিং-প্রতিভার ঝলক তাঁর স্বল্পকালীন অধিনায়কত্বের মধ্যে আদৌ পরিলক্ষিত হয়নি। ব্যাট হাতে রিচার্ডসের বিশালত্ব এবং অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বে ঠিক তেমনভাবে কাজে লাগেনি। লয়েডের মতো সামনে থেকে দলকে টেনে নিয়ে যাবার মতো দক্ষতা রিচার্ডসও দেখাতে পারবেন কিনা এই মুহূর্তে এই সংশয়ে দুলছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট অনুরাগীরা। রিচার্ডসকে নিয়ে আমাদের মনেও একটা নরম জায়গা আছে। লয়েডের মতোই ভিভেরও টেস্ট ক্রিকেটের শুরুটা ভারতেরই মাটিতে। দেখা যাক, অধিনায়ক হিসেবে লয়েডের কৃতিত্ব এবং গৌরবকে ভিভ ছুঁতে পারেন কিনা।

বাবলের বুলি-৪

আমার সঙ্গে ধরতে বাজি আছ রাজি ?

এই কথাটি বলতে চাও, আগে একটি বাবল বানাও, তারপর এক কানের লতিতে টান দাও।

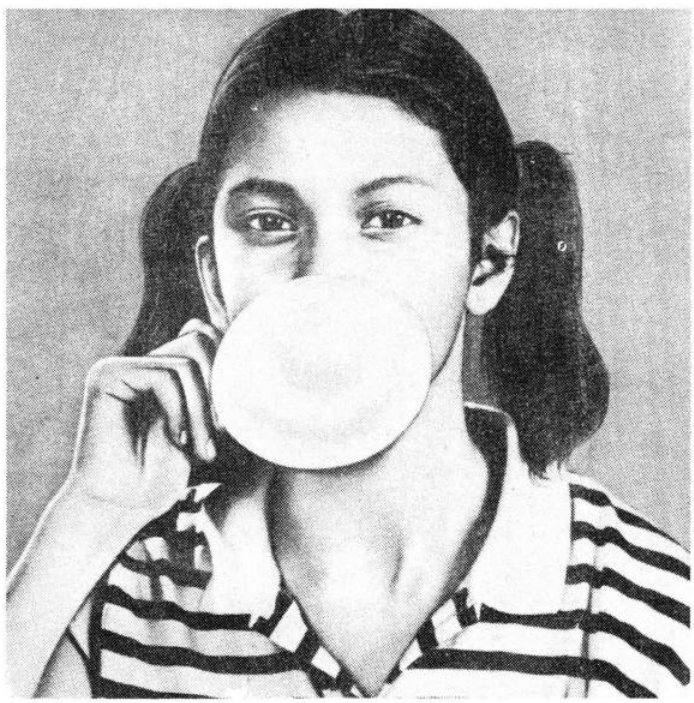

বিগ ফান-এর বিরাট বাবল বন্ধুদের তাক্ লাগাবে কেবল! বাবল বানানো একদম সোজা, এই খেলাতে অফুরান মজা।

মুখে ফেল বিগ ফানের বাবলটা, তারিয়ে তারিয়ে চিবোও যতক্ষণ না হয় চিঁড়েচ্যাপ্টা।

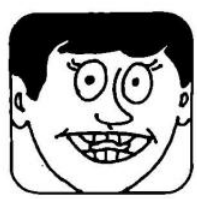

সামনের দাঁতের পেছনের দিকে জিভের ডগাটি দিয়ে ঠেসে ধর তাকে।

জিব-দিয়ে-করা খালি জায়গায় ফুঃ ফুঃ দাও ফুঁ যত পারা যায়। উঁরিব্বাস্, তারপর বাবল এক জ-ব্ব-র!

বিগ ফান

বাবল গাম

মস্ত বড়ো বাবল...
এক্কেবারে সোজা!

বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতই সেরা

অশোক রায়

কারা যেন বলেছিলেন, "ভারতের প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়টা নিতান্তই 'ফ্লুক'।" কারা যেন একথাও বলেছিলেন, "এশিয়া কাপে ভারতের জয়টা মোটেই আহামরি ব্যাপার নয়।" ভারী জানতে ইচ্ছে করছে, বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ান হওয়াটাকে এবার তাঁরা কী বলবেন!

ভিক্টোরিয়ার দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সাত টেস্ট-প্লেয়িং দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক টুর্নামেণ্ট হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ায়, দিন আর রাতের রঙিন আলোয়। ভারতের গ্রুপে ছিল পাকিস্তান, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া। অন্য গ্রুপে ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা।

লিগের প্রথম ম্যাচেই ভারত মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের। সম্মানের লড়াইয়ে পাকিস্তান ১৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায় বিনি, শাস্ত্রী আর শিবরামকৃষ্ণনের আক্রমণে। কিন্তু ভারতের অনায়াস জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান পাকিস্তানের সুদর্শন অলরাউণ্ডার ইমরান খান। ক্রিকেটের আসরে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে বল হাতে নিয়েই ইমরান ফুঁসে ওঠেন, ভয়ঙ্কর অতীতের মতোই। প্রথম পাঁচ ওভারেই শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত ও বেংসরকরকে ফেরত পাঠিয়ে ভারতীয় শিবিরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন ইমরান। ঠিক সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জুটি বাঁধেন প্রবীণ গাওস্কর ও নবীন আজহার। সদ্যসমাপ্ত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু হয় আজহারের অভিযান। আজহারের ব্যাট (৯৩) জানিয়ে দিল, বিদেশের মাটিতেও সে সমান স্বচ্ছন্দ হতে শিখেছে।

পরের ম্যাচ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ নিয়ে ভাবনা ছিল। সম্প্রতি ওয়ান-ডে সিরিজে ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারত হেরেছে ৪-১ মার্জিনে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হাওয়া ঘুরল

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ

উল্টোমুখে। ধ্বংসকার্যটি শুরু করেন শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের হাতের ব্যাট হাতুড়ির মতো নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হল শুধু ইংলিশ বোলারদের থ্যাঁতলানোর জন্যেই। ভারত করল ২৩৫ রান। পেশাদার ইংরেজদের কাছে ভারতের এই রান এক চুমুকে ঠাণ্ডা কফির কাপ খালি করার মতোই সহজ কাজ ছিল। কিন্তু সহজ কাজ সহজে হল না। শাস্ত্রী, শিবার স্পিনে ইংল্যাণ্ড অল আউট হল ১৪৯ রানে। লিগের শেষ খেলায় ভারত

সুনীল গাওস্কর (গোধূলিবেলায় নূতন গৌরব)

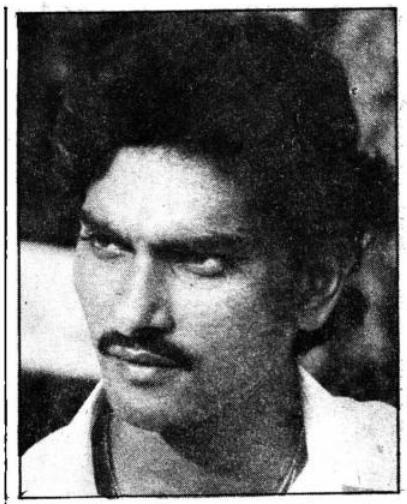

রবি শাস্ত্রী (চ্যাম্পিয়ান অব চ্যাম্পিয়ান্‌স)

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও জিতল। শ্রীকান্তের ঝোড়ো ব্যাটের দাপটে (৯৩ নট আউট) ধুলোয় মিশে গেল অস্ট্রেলিয়া। ভারত গ্রুপে শীর্ষস্থান নিয়ে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হল 'বি' গ্রুপের রানার্স আপ নিউজিল্যাণ্ডের।

নিউজিল্যাণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে দুশো ছ' রানের ইনিংস গড়েও কিন্তু ম্যাচ জিততে পারল না। প্রচণ্ড চাপের মুখে দাঁড়িয়ে কপিলদেব (৫৪) ম্যাচ ছিনিয়ে আনেন, যেভাবে জেতানো একমাত্র কপিলদেবের পক্ষেই সম্ভব। কপিলের সঙ্গে দারুণভাবে সহযোগিতা করেন বেংসরকর (৬৩)। ভারত ফাইনালে পৌঁছয় দুর্দান্ত খেলে।

ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে পাকিস্তান পৌঁছয় ফাইনালে। ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান সাক্ষাৎকারের শুরুতেই পাকিস্তানকে ছত্রভঙ্গ করেন কপিলদেব, তিনটি নির্ভরযোগ্য খুঁটি নড়িয়ে দিয়ে। মাঝপর্বে ইমরান-মিয়াঁদাদ জুটির ৬৮ রান সত্ত্বেও পাকিস্তান শেষপর্যন্ত ১৭৬ রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারেনি। সামনে তেমন বড় রানের চাপ না থাকায় ভারতীয় ইনিংস শাস্ত্রী ও শ্রীকান্ত শুরু করেন সহজভাবে। শ্রীকান্তের মনে রাখার মতো ৬৭ রানের ইনিংসটি তাঁকে ফাইনালে 'ম্যান অব দি ম্যাচের' এবং ভারতকে জয়ের সম্মান এনে দেয়। ধারাবাহিক ভাল খেলার সুবাদে শাস্ত্রী টুর্নামেণ্টের 'সেরা খেলোয়াড়ের' পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন একটি চমৎকার দামি গাড়ি। তিনিই এই টুর্নামেণ্টে 'চ্যাম্পিয়ান অব চ্যাম্পিয়ান্‌স'।

মতি নন্দী এবং খেলার পৃথিবী

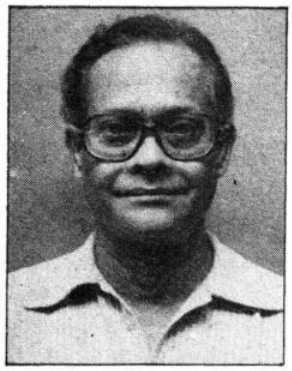

মতি নন্দী এমন এক জগৎ নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি অসামান্য গল্প এবং উপন্যাস, যে-জগতের মাত্র একটা দিকই আমরা জানতাম এতকাল। খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়দের নিয়ে লেখা তাঁর এই সব কাহিনীতে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন ভিতরের পৃথিবীর অদেখা রহস্য। ক্রিকেট নিয়ে 'ননীদা নট আউট', ফুটবল নিয়ে 'স্ট্রাইকার' ও 'স্টপার', সাঁতার নিয়ে 'কোনি' এবং ক্রিকেট ও টেনিস নিয়ে লেখা নতুন বই 'অপরাজিত আনন্দ' আর খেলা নিয়ে লেখা মতি নন্দীর যাবতীয় গল্পের সংগ্রহ 'এম্পিয়ারিং' এমন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেয় আমাদের যে, সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখতে শিখি আমরা খেলার জগৎ তথা মানুষের জীবনকে। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও খেলা নিয়ে মতি নন্দীর অন্য দুটি বইও অপরিহার্য। একটি হল 'ক্রিকেটের আইনকানুন', অন্যটির নাম 'খেলার যুদ্ধ'।

মতি নন্দীর বই : ননীদা নট আউট ৬·০০ স্ট্রাইকার ১০·০০ স্টপার ১২·০০ কোনি ৮·০০ এম্পিয়ারিং ১০·০০ অপরাজিত আনন্দ ১২·০০ ক্রিকেটের আইনকানুন ১২·০০ খেলার যুদ্ধ ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

টেনিসে ভারত ইতালিকে হারাল

সুজয় সোম

বিজয় অমৃতরাজ (দুটি সিঙ্গলসেই বিজয়ী)

চড়া রোদ, প্যাচপেচে গরম ছাপিয়ে টগবগে উত্তেজনায় তিনটে চমৎকার দিন কাটালুম কলকাতার সাউথ ক্লাবে। উনিশশো পঁচাশি সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালের যুদ্ধ। সবুজ ঘাসের কোর্টের উপযুক্ত ট্যাকটিক্স নিয়ে আটই মার্চ সকালে প্রথম সিঙ্গলস দারুণভাবে শুরু করলেন রমেশ কৃষ্ণান। নেটের কাছে এসে খেলছিলেন। ফ্রান্সেসকো ক্যান্সেলোট্টি ছিলেন বেসলাইনে দাঁড়িয়ে। প্রথম সেটে হারার পর, দ্বিতীয় সেটের গোড়াতেও বেকায়দায় পড়ে, তড়িঘড়ি ট্যাকটিক্স বদলে তিনি নেটের কাছে চলে আসতেই রমেশের দাপট কমে গেল। ৬-৩, ১১-৯ গেমে প্রথম দুটো সেট জিতে রমেশ খামোখা আলগা দিলেন। ম্যাচ অমনি ২-২ সেটে পৌঁছে গেল। ফ্রান্সেসকো জিতলেন ৬-৪, ৬-৩ গেমে। পঞ্চম সেটের লড়াই দেখার কথা অনেকদিন মনে থাকবে। দুটো পাসিং শট, বারকয়েক সার্ভিস ব্রেক, সেই সঙ্গে ফ্রান্সেসকোর কয়েকটা ডাবল ফল্টকে কাজে লাগিয়ে রমেশ ৬-৪ গেমে জিতে গেলেন। পাঁচটা সেটেই অসাধারণ সার্ভিস (যেমন পাওয়ার, তেমনি স্পিন !) করেও একের পর এক ভুলের মাসুল দিলেন ফ্রান্সেসকো। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের র‍্যালিতে কোর্টে বল রেখে পার্সেন্টেজ টেনিস না খেলে, আগাগোড়াই ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি পয়েন্ট পাবার চেষ্টা ! একগাদা নেগেটিভ পয়েন্ট উপহার পেলেন রমেশ।

দ্বিতীয় সিঙ্গলসে ভারতীয় অধিনায়ক বিজয় অমৃতরাজের কাছে প্রথম দুটো সেটে ১-৬, ৪-৬ গেমে হেরে গিয়েও, সুযোগ বুঝে জাঁকিয়ে বসে পরের দুটো সেট ছিনিয়ে নিলেন ক্লডিও পানাত্তা : ৭-৫, ৬-৩। আসলে ম্যাচের বয়স যত বাড়ছিল, ততই অগোছালো, মন্থর, ক্লান্ত লাগছিল বিজয়কে। তাঁকে বাঁচিয়ে দিল ডেভিস কাপের আইন : এক দিনে সাত ঘণ্টার বেশি খেলা হবে না ! পঞ্চম সেট শনিবারের জন্য তোলা রইল। খেলার শেষে দেখা হতে ইতালি দলের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন আদ্রিয়ানো পানাত্তা কথায় কথায় বললেন, "ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, ঝরঝরে শরীর, মন নিয়ে প্রথম দুটো সেটে বিজয় এই বত্রিশ বছর বয়সেও পৃথিবীর যে-কোনও টেনিস তারকার কাছে বিপজ্জনক।"

পরের দিন সকালে বিজয়ের সেই চেহারা দেখলুম। শুরুতে টেনশনে ভুগলেও, চটপট আক্রমণে ফিরে আটাশ মিনিটেই ৬-৩ গেমে পঞ্চম সেট জিতে নিলেন।

ডাবলসে টিমওয়ার্ক বা নিজেদের বোঝাপড়ার অভাবে আনন্দ অমৃতরাজ ও শশী মেনন স্ট্রেট সেটে বেমালুম কুপোকাত। ৬-২, ৬-৩, ৯-৭। জিতবার সামর্থ্যই ছিল না। মোটে একবার ইতালীয় জুটির সার্ভিস ভাঙতে পারলেন। প্রথম সার্ভিস থেকেও বেশিরভাগ সময়ে পয়েন্ট পেলেন না। বিশেষ করে শশী। ডাবলসে জিততে গেলে ফার্স্ট সার্ভিস থেকে পয়েন্ট নেওয়া বড্ড দরকার। একশো উনিশ মিনিট ধরে মুগ্ধ হয়ে দেখলুম গিয়ানি ওকলেপো ও ক্লডিও পানাত্তার দুর্দান্ত ভলি শট, সার্ভিস রিটার্ন, ডাউন দ্য লাইন শট !

উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল ফিরতি সিঙ্গলসের প্রথম খেলায়, রোববার সকালে। প্রথম সেটে ৫-৪ গেমে এগিয়ে গিয়েও বিজয় হেরে গেলেন। ৫-৭। আচমকা দুটো সাধারণ বল মিস করলেন। দুটো সার্ভিসও ডাবল ফল্ট হল। উঠে-পড়ে লেগে দ্বিতীয় সেট থেকে লড়াইয়ে ফিরে এলেন। লব, ভলি বা সার্ভিসে, শেষ পর্যন্ত গোটা খেলাতেই ছাড়িয়ে গেলেন ফ্রান্সেসকোকে। এমনকী দশ বছরের ছোট প্রতিদ্বন্দ্বীকে হার মানালেন রিফ্লেক্স, গতিতেও। ৬-৪, ৬-৩, ৮-৬ গেমে পরের তিনটে সেট জেতার ফাঁকে নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন ! কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতকে খেলতে হবে সুইডেন ও চিলির খেলার বিজয়ীর বিরুদ্ধে।

শেষের সিঙ্গলস নিছকই নিয়মরক্ষার খেলা। সাদামাটা প্রদর্শনী টেনিসের চেহারা নিল। রমেশ গা ঘামাতে চাইলেন না। ৬-৮, ৬-৪, ৬-১ গেমে ক্লডিও জিতে গেলেন।

ভুল শুধরে নাও : ৬ মার্চ তারিখের আনন্দমেলায় নেহরু 'স্বর্ণকাপ-হাতে রুশ অধিনায়ক'-এর যে ছবি ছাপা হয়েছিল, সেটি ভুল ছবি। বিরাটি থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীপ্রিয়ঙ্কর দাশগুপ্ত এই ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ। নির্ভুল ছবিটি এখানে ছাপা হল।

জিতেও নিরাশ করল রুশিরা

নৃপতি চৌধুরি

বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি সবে থেমেছে। আমেরিকার স্প্রিংফিল্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জেমস নাইসস্মিথ বৃষ্টিতে ক্লাস করতে না পেরে ভাবছিলেন কী করে ছাত্রদের একটা খেলার মধ্যে আটকে রাখা যায়। হঠাৎ একটা আপেল-বোঝাই লরি এসে দাঁড়াল। একটি লোক লরি থেকে নেমে একটা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়াল নীচে এসে। আর লরির ওপর থেকে একটা লোক ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওই ঝুড়িতে আপেল ভর্তি করতে লাগল। প্রতিদিনের এক ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু ওই ছোট্ট সাধারণ ঘটনাই সেদিন অসাধারণ ছাপ ফেলল নাইসস্মিথের মাথায়। আবিষ্কৃত হল (১৮৯১ সাল) ঝুড়ি-বল খেলা, যার বর্তমান পরিচিত নাম বাস্কেট বল। এখন সারা বিশ্বে বাস্কেট বল খেলে প্রায় চার কোটি মানুষ, এর মধ্যে রাশিয়াতেই খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ওলিম্পিকে বাস্কেট বল প্রথম চালু হয় বার্লিনে ১৯৩৬ সালে। যদিও ভারত সর্বপ্রথম যোগ দেয় ১৯৮০-র মস্কো ওলিম্পিকে। ওলিম্পিক বাস্কেটবলে রাশিয়ার আবির্ভাব ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে। এবং প্রথমবারেই রুপোজেতা দিয়ে নজর কাড়ার শুরু। এরপর ১৯৮০ মস্কো ওলিম্পিক পর্যন্ত প্রতিটি আসরেই হাজির থেকেছে রাশিয়া। এই আটটি আসর থেকে সোনা একটি, চারটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ তুলে এই দেশটি প্রমাণ করেছে যে, বিশ্ব বাস্কেটবলে রাশিয়া এক সমীহ-জাগানো শক্তি।

ক'দিন আগে ১৪জনের দল নিয়ে কলকাতায় এসেছিল রাশিয়ান বাস্কেটবল টিম। ১৯৮৪র সিওল ওলিম্পিকের জন্যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ষাট জনকে পাঁচটি দলে ভাগ করে বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছে রাশিয়া। উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা অর্জন।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত-রাশিয়ার প্রথম টেস্ট শুরুর আগেই আমাদের জানা ছিল যে, এটা রাশিয়ার জাতীয় দল নয়। তবে যেহেতু দেশটার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ব-বাস্কেটবলে তাঁদের শক্তি প্রবল তাই প্রত্যাশা ছিলই যে, তাঁদের খেলায় বুদ্ধির চমক মিলবে। কিন্তু বলতেই হচ্ছে আমরা হতাশ হয়েছি। বরং ওপর থেকে ঝরনাধারার মতো নেমে-আসা নরম আলোয়, ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো ঝক্‌ঝকে নেতাজি ইনডোরে দাপিয়ে খেলেছে ভারতীয় খেলোয়াড়রা। যদিও অধিনায়ক আবদুল হামিদ এবং সজ্জন সিং বাদে ভারতীয় দলে অধিকাংশই ছিলেন জুনিয়র।

ভারত খেলেছে ২-১-২ ফর্মেশানে। একটু ডিফেন্সিভ রণনীতি। সম্ভবত প্রতিপক্ষের বিরাট নামডাক এবং নিজেদের জুনিয়র খেলোয়াড়দের অনভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করেই ভারত আগে ঘর সামলাবার কথা মাথায় রাখে। হাফ-টাইম স্কোর ছিল ৪০-৪০। গায়ের রঙের তফাতটুকু ছাড়া দুটি দলের পার্থক্য তেমনভাবে নজরে পড়েনি। রাশিয়ার দলনায়ক সার্গেই মেদভেদভ, আনাতোলি ইয়াসিনাস্কিদের পাশাপাশি ভারতীয় অধিনায়ক আবদুল হামিদ, সজ্জন সিংরাও সমানভাবেই নজর কেড়েছেন। বিশেষত, দ্বিতীয়ার্ধে লং এবং শর্ট শটে হামিদের বাস্কেট করার মুনশিয়ানা মুগ্ধ করে দর্শকদের। প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও ভারত উপভোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে। সমাপ্তির চার মিনিট আগেও রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের ফল ছিল ৬১-৬৭। কিন্তু শেষ দেড় মিনিটের রুশি-ঝটকায় ভারত পিছিয়ে যায় ৬৬-৭৭ পয়েন্টে।

রাশিয়ার পক্ষে যেমন তাপমাত্রা, ভারতীয়দের কাছে তেমনি প্রধান অসুবিধে ছিল বিপক্ষের উচ্চতা।

সজ্জন

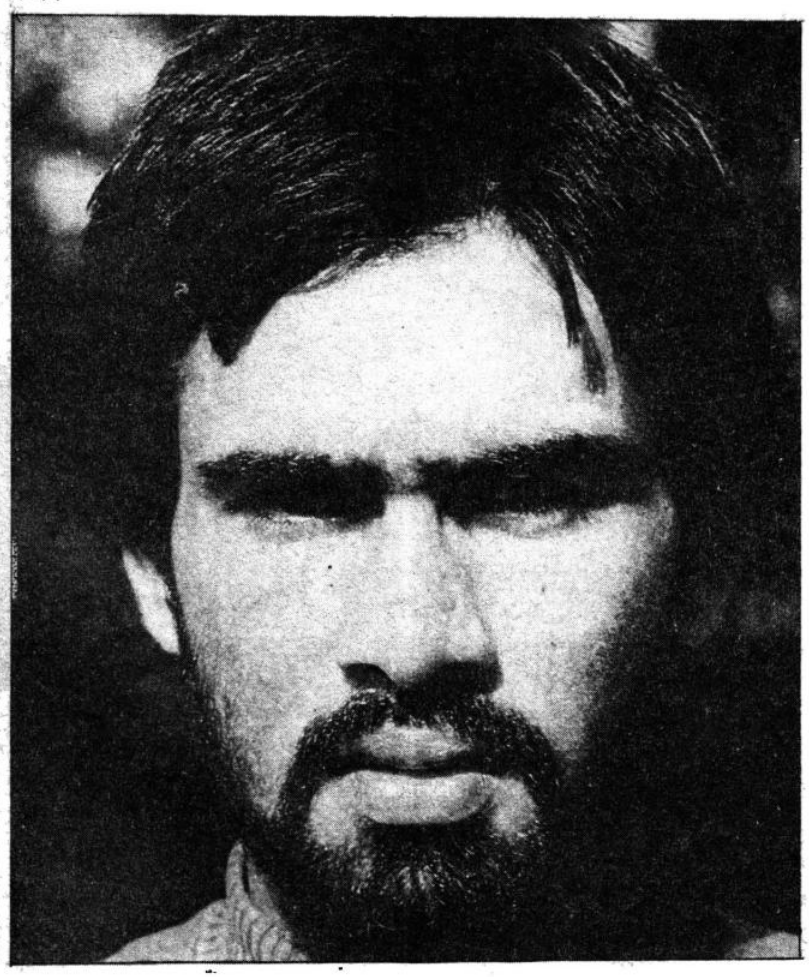

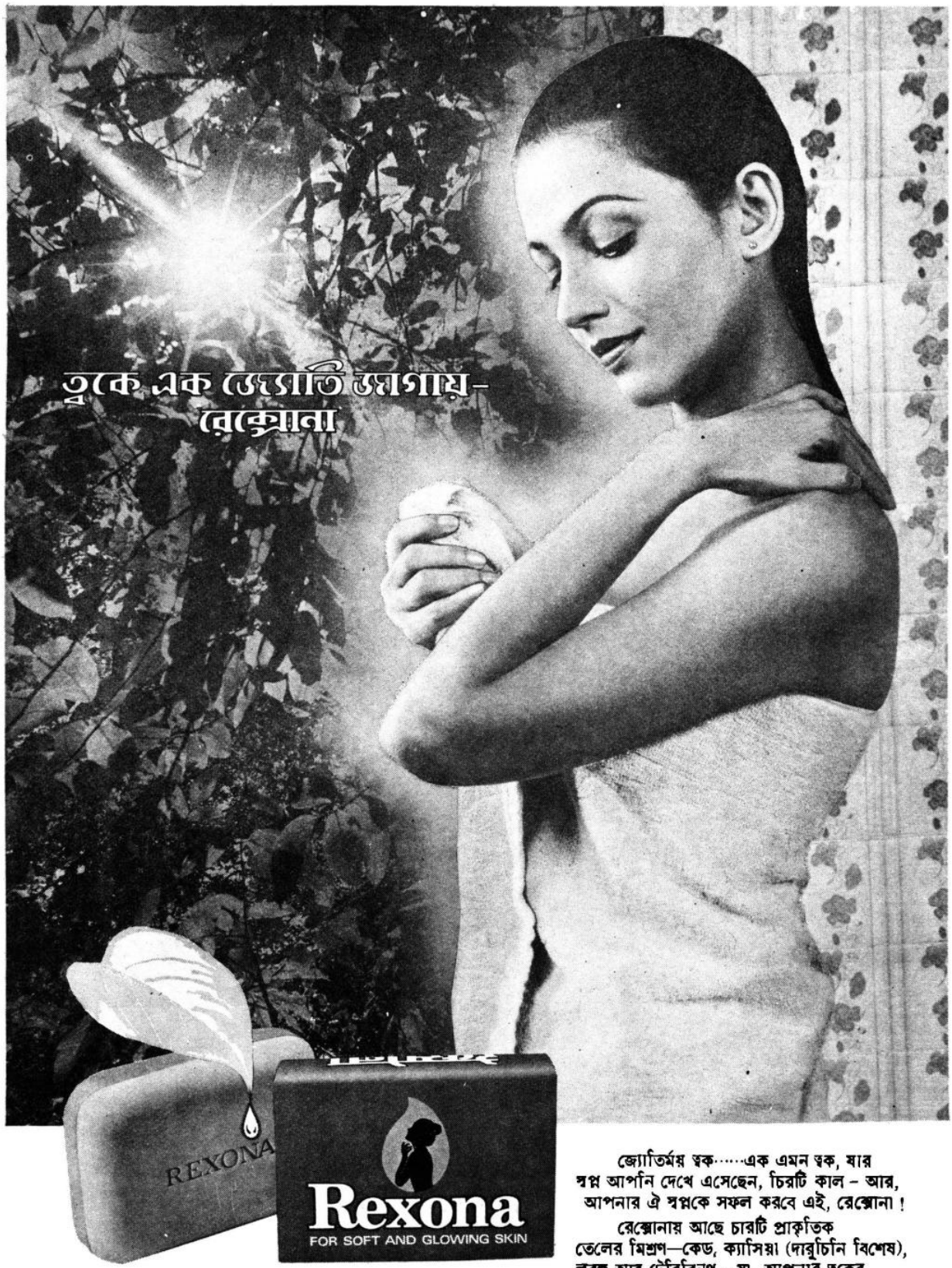

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

...JANDAMELA 3 APRIL, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

তরতাজা স্বাদ, চনমনে গন্ধ...

দার্জিলিং আর পাহাড়তলির বাছাই করা ফল থেকে–জিভে জল আসা জ্যাম, জেলী, মার্মালেড, স্কোয়াশ, সস্, টিনেভর্ত্তি জুস্, আনারসের মিষ্টি চাকা আর টিট্‌বিট্‌স্।

Kanchan

Darjeeling Fruit & Vegetable Processing Co-operative Society Ltd.

Mileage/K-2